আমরা কেউ বাসায় নেই

হুমায়ূন আহমেদ

সূত্রঃ প্রথমআলোর শুক্রবারের ক্রোড়পত্র ‘অন্য আলোয়’ প্রকাশিত
প্রথমআলো কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমাদের বাসায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আরও খোলাসা করে বললে বলতে হয় দুর্ঘটনা ঘটছে বাসার শোবার ঘরের লাগোয়া টয়লেটে। কী দুর্ঘটনা বা আসলেই কিছু ঘটেছে কি না তাও পরিষ্কার না। গত ৩৫ মিনিট ধরে বাবা টয়লেটে। সেখান থেকে কোনো সারাশব্দ আসছে না। মা কিছুক্ষণ পর পর দরজা ধাক্কাচ্ছেন এবং চিকন গলায় ডাকছেন, এই টগরের বাবা! এই!

মা হচ্ছেন অস্থির রাশির জাতক। তিনি অতি তুচ্ছ কারনে অস্থির হন। একবার আমাদের বারান্দায় একটা দাঁড়কাক এসে বসল, তার ঠোঁটে মানুষের চোখের মত চোখ। মা চিৎকার শুরু করলেন। মা মনে করলেন দাঁড়কাকটা জীবন্ত কোনো মানুষের চোখ ঠোকর দিয়ে তুলে নিয়ে চলে এসেছে। এক পর্যায়ে ধপাস, অর্থাৎ জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পতন।

বাবা ৩৫ মিনিট ধরে শব্দ করছে না। এটা মার কাছে অস্থির হওয়ার মত ঘটনা। মা যে এখনো মূর্ছা যাননি এটা একটা আশার কথা। মা এখন আমাদের ঘরে, আমি এবং টগর ভাইয়া এই ঘরে থাকি। মার মনে হয় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তিনি বাজার থেকে কেনা বোয়াল মাছের মত হাঁ করছেন আর মুখ বন্ধ করছেন।

টগর ভাইয়া বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার বুকের ওপর একটা বই ধরা। বইটার নাম other world, বইটা উল্টা করে ধরা। টগর ভাইয়া প্রায়ই উল্টা করে বই পড়তে পছন্দ করেন।

মা বললেন, টগর এখন কী করি বল তো! দরজা ভাঙবো?

ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, ভাঙো। কবি নজরুল হয়ে যাও।

কবি নজরুল হব মানে?

ভাইয়া বুকের উপর থেকে বই বিছানায় রেখে উঠে বসতে বসতে বলল, ‘লাথি মারো ভাঙরে তালা যতসব বন্দিশালা!’ মা তুমি একটা চায়নিজ কুড়াল জোগাড় করো,আমি দরজা কেটে বাবাকে উদ্ধার করছি। ঘরে কি চায়নিজ কুড়াল আছে?

মা ক্ষীণ গলায় বললেন, না তো!

ভাইয়া বললেন চায়নিজ কুড়াল অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। সব বাড়িতেই দুটো করে থাকা দরকার। একটা সাধারণ ব্যবহারের জন্য। অন্যটা হলো স্পেয়ার কপি। লুকানো থাকবে। আসলটা না পাওয়া গেলে তার খোঁজ পরবে।

মা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, উল্টা পাল্টা কথা না বলে একটা ব্যবস্থা কর। বাথরুমের দরজা পলকা, লাথি দিলেই ভাঙবে।

ভাইয়া, বলল লাথি দিয়ে দরজা ভাঙলাম, দেখা গেল বাবা নেংটো হয়ে কমোডে বসে আছেন। ঘটনাটা বাবার জন্য যথেষ্ট অস্বস্তিকর হবে। এই বিষয়টা কি ভেবেছ?

টগর আয় তো বাবা আয়।

ভাইয়া বিছানা থেকে নামলো। সেনাপতির পেছনে সৈন্যসামন্তের মত আমি এবং মা পেছনে। শোবার ঘরে ঢুকে দেখি বাবা বিছানায় বসে আছেন। তার কাঁধে টাওয়েল। তিনি মার দিকে তাকিয়ে বললেন, এক কাপ লেবু চা দাও তো!, করা হয় না যেন। টি-ব্যাগ এক মিনিট রেখে উঠিয়ে ফেলবে।

মা বিদ্যুৎ বেগে রান্নাঘরেরে দিকে ছুটলেন। আমরাও মার পেছনে পেছনে গেলাম। টয়লেট দুর্ঘটনা নাটকের এখানেই সমাপ্তি।

এখন আমাদের পরিচয় দেয়া যাক

বাবা

বয়স ৬৩। একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়ান। সপ্তাহে দুদিন একটা টিউটেরিয়াল হোমে ইংরেজী শেখান। বাবা অত্যন্ত সুপুরুষ। তার পরও কোনো এক বিচিত্র কারনে ছাত্রমহলে তাঁর নাম মুরগি স্যার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিউটেরিয়াল হোমেও বাবার এই নাম চালু হয়ে গেছে। বাবা বাসায় মা ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা বলেন না। মার সঙ্গে তার কথাবার্তাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এসএমএস ধরণের। উদাহরণ 'টেবিলে খাবার দাও খেতে বসব'। এই বাক্য দুটির জন্য বাবা শুধু বলবেন, 'Food!'.

একজন সাহিত্যের অধ্যাপক এর বেশ কিছু বইপত্র থাকার কথা। তার বইপত্রের মধ্যে আছে দুটো ইংরেজী ডিকশনারী। একটা কৌতুকের বই, নাম Party Jokes.আমি পুরো বই পড়ে দেখেছি কোনো হাসি আসে না। সেই বই থেকে একটা জোকের নমুনাঃ

A physician told me about one of his favorite patients. The doctor once asked the fellow it he had lived in the same place all his life. The man replied, 'No, I was born in the bedroom next to the one where I sleep now.'

বাবাকে ডিকশনারী প্রায়ই পড়তে দেখা যায়। তখন তাঁর মুখ থাকে হাসি হাসি। এই সময় যে কেউ তাঁকে দেখলে মনে করবে তিনি রোমান্টিক কোনো উপন্যাস পরছেন।

তিনি টেলিভিশন দেখেন না, মাঝে মধ্যে ইংরেজী খবর পাঠ দেখেন। খবর পাঠ শেষ হওয়া মাত্র বিরক্ত মুখে বলেন, ভুল উচ্চরণ থাবড়ানো দরকার। 'থাবড়ানো দরকার' তাঁর প্রিয় বাক্য। সবাইকে তিনি থাবড়াতে চান। রিকশাওয়ালা দুই টাকা বেশি নিলে তিনি বিড়বিড় করে বলবেন, থাবড়ানো দরকার।

বাবা স্বাস্থ্যের প্রতি অত্যান্ত যত্নশীল। প্রতিদিন ভোরবেলা তাঁকে উঠনে ঘড়ি ধরে ২০ মিনিট হাঁটতে দেখা যায়। ২০ মিনিট পার হলে ১০ মিনিট ফ্রী এক্সারসাইজ করেন। হন্টন ও এক্সারসাইজের হিসাব রাখেন মা। তিনি বারান্দার মাঝখানে হাতঘড়ি নিয়ে বসে থাকেন। ২০ মিনিট পার হওয়ার পর বলেন, Time out. ১০ মিনিট ফ্রীহ্যান্ড এক্সারসাইজ পর আবার বলেন, Time out. বাবা চান মা তার সাথে ইংরেজীতে কথা বলেন। মা Time out ছাড়া আর কোনো ইংরেজী বলেন না।

খাবার দাবার বিষয়ে বাবাকে উদাসীন মনে হয়। তবে কিছু বিশেষ খাবার তার অত্যান্ত পছন্দ। এই খাবার গুলোর রন্ধন প্রক্রিয়া যথেষ্ট জটিল। শুধু একটি উল্লেখ করি। কলার মোচার বড়া। কলার মোচা প্রথমে ভাপে সেদ্ধ করতে হয়। তারপর ডিম মেশানো বেসনে মেখে অল্প আঁচে ভাজতে হয়।

বাবার বিনোদনের ব্যপারটা বলি। মাঝে মধ্যে তাকে মোবাইল ফোনে একটি গেম খেলতে দেখা যায়। এই খেলায় সাপকে আপেল, আঙ্গুর খাওয়াতে হয়। এ সব সুখাদ্য খেয়ে সাপ মোটা হয়। সাপ ঠিকমতো খাদ্য গ্রহন না করলে বাবা চাপা গলায় বলেন থাবড়ানো দরকার।

মা

ক্লাস টেনে পরার সময় বাবার সঙ্গে মার বিয়ে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক বিয়ের রাতে বাবা তিনটা বিড়াল মেরে ফেললেন। স্ত্রীর ইংরেজী জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তিনটি প্রশ্ন করেন। কোনোটার উত্তরই মা দিতে পারেন নি। প্রশ্নগুলো-

বাবাঃ Hornet শব্দের মানে কী?'

মাঃ (ভীত গলায়) জানি না।

বাবাঃ Wood apple মানে কি?

মাঃ (আরও ভীত) জানি না।

বাবাঃ Daily life মানে কী?

মাঃ (ফোঁপাতে ফোঁপাতে) জানি না।

মা পরে আমাকে বলেছেন Daily life মানে তিনি জানতেন। ভয়ে মাথা আউলিয়ে গিয়েছিল।

বাবাঃ তুমি তো কিছুই জানো না, ফাজিল মেয়ে। তোমাকে থাবড়ানো দরকার। বিয়ের রাতে মা যে ভয় পেয়েছিলেন সেই ভয় এখনো ধরে রেখেছেন। বাবাকে তিনি একজন মহাজ্ঞানী রাজপুত্র হিসাবে জানেন। তাঁর সামনে সব সময় নতজানু হয়ে থাকতে হবে, এটি তিনি বিধির বিধান হিসাবেই নিয়েছেন।

মা বাবাকে ভয় পান ও প্রচন্ড ভালোবাসেন। ভয় ও ভালোবাসার মত সম্পূর্ণ বিপরীত আবেগে একসঙ্গে ধরা কঠিন কিন্তু মা ধরেছেন। বাবার প্রতি মার ভালোবাসার একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

বাবাকে তার ছাত্রছাত্রীরা মুরগি ডাকে এই খবর প্রথম শুনে তিনি মাথা ঘুরে মেঝেতে পরে কপালে ব্যাথা পেয়েছিলেন। মাথায় পানি ঢেলে মোটামুটি সুস্থ করার পর মার প্রথম বাক্য। টগর, সত্যি তোর বাবকে সবাই মুরগি ডাকে?

ভাইয়া বলল, মুরগি সবাই ডাকে না, কেউ কেউ ডাকে মুর্গ, মুরগির চেয়ে মুর্গ শব্দটা ভালো। মুর্গ শুনলে মাথায় আসে মুর্গ মুসাল্লাম। মুর্গ মুসাল্লাম একটি উচ্চমানের মোঘলাই খানা। কাউকে মুর্গ ডাকা তার প্রতি সম্মানসূচক।

রূপবান পুরুষদের স্ত্রীরা কুরূপা হয় এটা নিপাতনে সিদ্ধ। মা নিয়মের ব্যতিক্রম।

তিনি যে শুধু রূপবতি তা না, তার বয়স মোটেই বাড়ছে না। তাঁকে এখনও খুকী মনে হয়। আমেরিকান সায়েন্টিস্টরা খবর পেলে মার 'জিন' নিয়ে গবেষণা করে কিছু বের করে ফেলত।

মা অত্যান্ত অলস প্রকৃতির। সকাল ১০-১১ টার আগে কখনো বিছানা থেকে নামেন না। তিনি অনেক ধরনের রান্না জানেন কিন্তু রাঁধেন না। মার একটি বিশেষ অর্জন বলা যেতে পারে। স্কুলে ক্লাস এইটে পরার সময় মা শরৎচন্দ্রের *দেবদাস* উপন্যাস পুরোটা মুখস্ত বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। *দেবদাস* এখনো তার মুখস্থচর্চার মধ্যে আছে। প্রায়ই তাঁকে *দেবদাস* হাতে নিয়ে শুয়ে থাকতে দেখা যায়।

টগর ভাইয়া

খুব ভালো রেজাল্ট করে বুয়েট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পাস করেছে। তাকে বুয়েটে লেকচারার পদে যোগ দিতে বলা হলো। ভাইয়া বলল, 'আমি চিৎকারক' হব না। লেকচারার হওয়া মানে ক্লাসে চিৎকার দেওয়া এর মধ্যে আমি নেই।

মা বললেন তাহলে কী হবি?

ভাইয়া বলল,কিছুই হব না। চিন্তা করে করে জীবন পার করে দেব।

মা বললেন, কী সর্বনাশ!

ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, সর্বনাশের কিছু না মা। এই পৃথিবীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আছেন, যারা কোনো কাজকর্ম ছাড়া শুধু চিন্তা করে জীবন পার করে দিয়েছেন। যেমন গৌতম বুদ্ধ।

তুই গৌতম বুদ্ধ হবি?

গৌতম বুদ্ধ হওয়া যায় না। আমি অন্য কিছু হব।

অন্য কিছুটা কী?

চট করে তো বলা যাবে না। ভেবেচিন্তে বের করতে হবে।

প্রায় তিন বছর হয়ে গেল ভাইয়া চিন্তা করে যাচ্ছে।

বেশির ভাগ সময় বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে তাকে পা নাচাতে দেখা যায়। এই সময় তার চোখ বন্ধ থাকে। ভাইয়া কখন জেগে আছে, কখন ঘুমাচ্ছে বোঝা যায় না। ঘুমের মধ্যেও সে পা নাড়তে পারে।

গতকাল রাতে বাবার সাথে ভাইয়ার কথা হয়েছে। বাবা বললেন, তোমার মার কাছে শুনলাম তুমি গৌতম বুদ্ধ হবে।

ভাইয়া শুয়ে ছিল। শোয়া থেকে উঠে বসতে বসতে বলল, তোমরা সবাই যদি চাও তাহলে গৌতম বুদ্ধের মত কেউ হওয়ার চেষ্টা করতে পারি। অনেক দিন হলো পৃথিবীতে নতুন কোনো ধর্ম আসছে না। নতুন ধর্ম আসার সময় হয়ে গেছে।

বাবা ঝিম ধরে কিছুক্ষন বসে রইলেন। ভাইয়াও বসে ঘন ঘন হাই তুলতে লাগল। এক সময় বাবা উঠে চলে গেলেন। বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন। কী বললেন পরিষ্কার বোঝা গেল না। মনে হয় থাবড়ানো বিষয়ে কিছু বললেন।

ভাইয়ার ঘরের দেয়ালে তার মাথার কাছে আইনষ্টাইনের একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি টাঙ্গানো। ছবিতে জিভ বের করে আইনষ্টাইন ভেঙ্গাচ্ছেন। ছবির নিচে ভাইয়া লিখে রেখেছেন- The great fool.

ভাইয়ার স্বভাবও মার মত অলস প্রকৃতির। গোসলের মতো প্রাত্যহিক কাজ তিনি আলস্যের কারনে করেন না। সপ্তাহে বড়জোর দুদিন তিনি গোসল করেন। গোসল না করার পিছনে তার যুক্তি হচ্ছে, পৃথিবীর অনেক দেশেই খাবার পানির ভয়ংকর অভাব, সেখানে গায়ে ঢেলে আমি এতটা পানি নষ্ট করব? অসম্ভব।

মা যেমন শুধু *দেবদাস* পড়েন, ভাইয়া সেরকম না। তার ঘর ভর্তি বই।

যতক্ষণ তিনি জেগে থাকেন ততক্ষণ তার মুখের সামনে বই ধরা থাকে।

আমি

আমার নাম মনজু। ভাইয়া যে রকম ব্রিলিয়ান্ট আমি সে রকম গাধা। দু বার বিএ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছি। দ্বিতীয়বার ফেলের বিষয়টা শুধু ভাইয়া জানে। বাবা-মা দুজনকেই পা ছুঁয়ে সালাম করে বলেছি, হায়ার সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি। মা মিষ্টি কিনে

বাড়িতে বাড়িতে পাঠিয়েছেন। আমাকে বলেছেন তোর পাশের খবরে এত খুশি হয়েছি! আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম তুই এবারও ফেল করেছিস।

[মার স্বপ্নের ব্যাপারটা বলতে ভুলে গেছি। মা যা স্বপ্নে দেখেন তাই হয়। একবার মা স্বপ্নে দেখলেন, রিকশা থেকে পরে বাবা পা ভেঙে ফেলেছেন। এক সপ্তাহ পর একই ঘটনা ঘটলো। বাবা রেগে গিয়ে বলেছিলেন, এ ধরনের স্বপ্ন কম দেখলে ভালো হয়। ভালো কিছু দেখবে, তা না পা ভাঙা, হাত ভাঙা। থাবড়ানো দরকার।

মা খুব লজ্জা পেয়েছিলেন।]

রহিমার মা

রহিমার মা আমাদের কাজের বুয়া। বিরাট চোর, তবে খুব কাজের। ভাইয়ার প্রতি তার আলাদা দুর্বলতা আছে বলে আমার ধারণা। ভাইয়ার যে কোনো কাজ করার জন্য সে ব্যাস্ত। ভাইয়ার সঙ্গে নানা ধরনের গল্পও করে। একদিন ভাইয়াকে বলল, ‘বুঝছেন ভাইজান, শইলটা নিয়া পড়ছি বিপদে। মানুষের বাড়িতে কাম করব কী সবাই শইলডার দিকে চায়া থাকে।

ভাইয়া বলল, ‘তাকিয়ে থাকার মত শরীর তো তোমার না রহিমার মা। তাকিয়ে থাকে কেন?’

কী যে কন ভাইজান, রইদে পুইড়া চেহারা নষ্ট হইছে, কিন্তু শইল ঠিক আছে। আইজ পর্যন্ত এমন কোনো বাড়িতে কাম করি নাই যেখানে আমারে কুপ্রস্তাব দেয় নাই। হয় বাড়ির সাহেব কুপ্রস্তাব দেয়। সাহেব না দিলে বেগম সাহেবের ভাই দেয়।

আমাদের বাড়ি থেকে তো এখনো কোনো কুপ্রস্তাব পাও নাই।

সময় তো পার হয় নাই ভাইজান। সময় আছে আর আমার শইলও আছে। যে দিন কুপ্রস্তাব পাবো আপনারে প্রথম জানাব। এইটা আমার ওয়াদা।

রহিমার মার বিয়ে হয়নি এবং রহিমা নামের তার কোনো মেয়েও নেই। সে ১৫-১৬ বছর বয়সে কাজ করতে গেল। কোনো বেগম সাহেব তাকে কাজে রাখে না। কুমারী মেয়ে রাখবে না। সে নিজেই তখন বুদ্ধি করে রহিমার মা নাম নিলো। দেশের বাড়িতে তার স্বামী

আছে, রহিমা নামের মেয়ে আছে। তখন তার চাকরি হলো। আমাদের এখানে দুই বছর ধরে আছে।

পরিবারের সবার কথাই তো মোটামুটি বলা হলো। এখন যে বাড়িতে থাকি তার কথা বলি। বাড়ি একটি জীবন্ত বিষয়। বাড়ির জন্ম-মৃত্যু আছে। রোগব্যাধি আছে। কোনো কোনো বাড়ির আত্মাও আছে। আবার আত্মা শুন্য নিষ্ঠুর বাড়িও আছে। আমরা থাকি ঝিগাতলার বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের কাছাকাছি, একটা গলির ভিতর। গলির নাম ছানাউল্লাহ সড়ক। ছানাউল্লাহ আওয়ামী লীগের এক নেতা। গলির নামকরণ ছানাউল্লাহ সাহেব নিজেই করেছেন। নিজ খরচায় কয়েক জায়গায় সাইনবোর্ড টানিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা ছানাউল্লাহ সড়ক বলে না। বলে মসজিদের গলি। গলির শেষ মাথায় মসজিদ আছে বলেই এই নাম। মসজিদের গলিতে বাবা ছকাঠা জায়গায় একতলা বাড়ি বানিয়েছেন। দোতালা করার শখ আছে। শখ মিটবে এ রকম মনে হচ্ছে না। বাবার জমি কেনার কিছু ইতিহাস আছে। জমিটা তিনি ও তাঁর এক বন্ধু ফজলু চাচা কিনেছিলেন। জমি কেনার এক সপ্তাহের মাথায় ফজলু চাচা মারা যান। জমি রেজিস্ট্রি এবং নামজারি বাবা নিজের নামে করে নেন।

ফজলু চাচার স্ত্রী তাঁর বাচ্চা মেয়েকে কয়েকবার এই বাড়িতে এসেছিলেন। প্রতিবারই বাবা অতি ভদ্রভাবে বলেছেন, ভাবি! ফজলু এবং আমি দুজন মিলেই জায়গাটা কিনতে চেয়েছিলাম। শেষ মুহুর্তে ফজলু টাকাটা দিতে পারেনি। টাকা নিয়ে সে রওনা হয়েছিলো এটাও সত্যি। পথে টাকা ছিনতাই হয়। ফজলু সাত দিনের মাথায় মারা যায়। টাকার শোকেই মারা যায়।

ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার গয়না বিক্রি করা টাকা। পদ্মর বাবা বলেছিল, টাকা আপনার হাতে দিয়েছে।

আপনাকে শান্ত করার জন্য বলেছে ভাবি। এতগুলো টাকা ডাকাতরা নিয়ে গেল। কাউকে বলাও তো কঠিন।

ভাই আমি এখন কী করব বলুন। পড়াশোনা নাইন পর্যন্ত। কেউ তো আমাকে কোনো চাকরীও দেবে না।

বিভিন্ন অফিসে চেষ্টা করতে থাকুন। নতুন নতুন মার্কেট হচ্ছে, তাদের সেলস গার্ল দরকার। তারা বেতনও খারাপ দেয় না। আমিও চেষ্টা করব।

বাবা যতক্ষণ কথা বলছিলেন বাচ্চা মেয়েটা ততক্ষণই একটা কাঞ্চি হাতে ছোটাছুটি করছিলো। আমি বললাম এই খুকি কী করছ?

সে বলল, আমার নাম খুকি না। আমার নাম পদ্ম।

আমি বললাম, এই পদ্ম, তুমি কাঞ্চি নিয়ে কী করছ?

বিড়াল তাড়াচ্ছি।

বিড়াল কোথায়?

তোমাদের বাড়িতে অনেকগুলো বিড়াল। তুমি দেখতে পাচ্ছ না। আমি পাচ্ছি। ওই দেখ একটা কালো বিড়াল।

পদ্ম কাঞ্চি হাতে কালো বিড়ালের দিকে ছুটে গেল।

ভাইয়ার কাছে শুনেছি, দু-তিন মাস পর পর ভাইয়াকে দিয়ে বাবা ফজলু চাচার স্ত্রীকে টাকা পাঠিয়েছেন। মেয়েদের এক স্কুলে আয়া শ্রেণীর চাকরীও জোগাড় করে দিয়েছিলেন। আমাদের এই বাড়ির আর্কিটেক্ট বাবা। মাঝখানে খানিকটা খালি জায়গা রেখে চারিদিকে ঘর তুলে ফেলেছেন। বড় ঘর, মাঝারি ঘর, ছোট ঘর ঘরের ছড়াছড়ি। এর মধ্যে দুটি ঘর তালাবদ্ধ, এই দুটি ঘর হলো গেস্টরুম। গেস্ট আসে না বলে তালা খোলা হয় না।

আমার মা'র ধারনা, বাড়িতে কোনো ঘর দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকলে সেখানে ভূত-প্রেত আশ্রয় নেয়। মা মোটামুটি নিশ্চিত তালাবদ্ধ ঘরের একটিতে একজন বৃদ্ধ ভূত বাস করে। মা অনেক বার খড়ম পায়ে ভূতের হাঁটার শব্দ শুনেছেন। মনে হয় যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ভূত। ভূত সমাজে অসুখ-বিসুখ থাকা বিচিত্র কিছু না। ভূতটা খড়ম পায়ে হাঁটে কেন তা পরিষ্কার না। খরম বাংলাদেশ থেকে উঠে গেছে। গ্রামের দিকেও স্পঞ্জের স্যান্ডেল। আমাদের এই ভূত অপ্রচলিত খড়ম কোথায় পেল কে জানে।

বৃদ্ধ ভূতের কিছু কর্মকাণ্ড আমি নিজের কানে শুনেছি। আমাদের বাড়ির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা চাপকল। এক রাতে শুনি চাপকলে চাপ দিয়ে কেউ পানি তুলছে। ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। বাইরে এসে দেখি, ফকফকা চাঁদের আলো। চাপকলের ধারে

কাছে কেউ নেই। আমি দৌড়ে ভাইয়ার ঘরে ঢুকলাম। ভূত দেখতে পাওয়া যেমন ভয়ংকর, তেমনি না দেখতে পাওয়াটাও ভয়ংকর। এরপর থেকে রাতে আমি ভাইয়ার সঙ্গে ঘুমাই। কী দরকার ভূত-প্রেত এর ঝামেলায় যাওয়ার।

ভাইয়া অবশ্য চাপকলের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। ভাইয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে চাপকলের ভেতরে থাকে পানি। মাঝেমধ্যে প্রাকৃতিক কারনে পানির স্তর উঠানামা করে, এমন কোন ঘটনা ঘটলে চাপকলের ভেতরের রিং স্ল্যাভ ওঠানামা করবে। বাইরে থেকে মনে হবে অদৃশ্য কেউ চাপকল চাপছে।

ভাইয়া যে কোনো বিষয়ে সুন্দর যুক্তি দিতে পারে। মাথার কাছে আইনস্টাইনের ছবি থাকার কারনে মনে হয় এরকম হচ্ছে।

আমাদের বিষয়ে যা বলার মোটামুটি বলা হয়ে গেছে। এখন মূল গল্পে আসা যেতে পারে। না না মূল গল্পে আসার আগে আমাদের গাড়ি কেনার গল্পটা বলে নেই।

সোমবারে বাবার দুটো ক্লাস। এই দিন তিনি সকাল ৭ টার আগে বাড়ি থেকে বের হন। এত সকালে রহিমার মার ঘুম ভাঙ্গে না বলে নাস্তা তৈরী হয় না। আমাকে দোকান থেকে নাস্তা নিয়ে আসতে হয়। দুটা পরোটা, বুন্দিয়া আর একটা ডিম সেদ্ধ। বাবা ডিমের কুসুম খেয়ে সাদা খোসা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, লবনের ছিটা দিয়ে খেয়ে ফেল।

অন্যের উচ্ছিষ্ট খাওয়া নোংরা ব্যাপার। বাবার দিকে তাকিয়ে প্রতি সোমবারে আমাকেই এই কাজটি করতে হয়। দুটো পরোটা তিনি খেতে পারেন না, একটা বেঁচে যায়। এই অর্ধেকের ভিতর বুন্দিয়া দিয়ে তিনি রোলের মত বানিয়ে বলেন, খেয়ে ফেল। বুন্দিয়া রোলও আমাকে খেতে হয়। সোমবার ভোর আমার জন্য অশুভ।

আজ সোমবার বাবা বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছেন না। চাপকলের কাছে লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে টিভি বিজ্ঞাপনের এনএফএলের চেয়ারম্যানের মত বসে আছেন। আমি বললাম, টাকা দাও নাস্তা নিয়ে আসি।

বাবা বললেন, তুই আমাকে ডিকশনারিটা এনে দে।

আমি ডিকশনারি এনে দিলাম, বাবা গম্ভীর ভঙ্গিতে ডিকশনারির পাতা উল্টাতে লাগলেন।

আগেই বলেছি মা কখনই ১০-১১ টার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারেন না। আজ সবই এলোমেলো, ৮ টার সময় মার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা উঠানে এসে চিন্তিত গলায় বললেন, কী হয়েছে ইউনিভার্সিটি যাবে না?

বাবা বললেন, না।

না কেন শরীর খারাপ।

বাবা ডিকশনারি বন্ধ করতে করতে বললেন, কাছে আসো। Come closer.

মা ভীত গলায় এগিয়ে এলেন। বাবা ফিস ফিস করে মাকে কিছু বললেন। কী বললেন আমি শুনতে পেলাম না, তবে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা। মার মুখের হাঁ বড় হয়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগলেন। তাঁর মাথা মনে হয় ঘুরছে, তিনি পরে যাওয়ার মত ভঙ্গি করলেন। বাবা চেয়ার থেকে উঠে মাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমি মার সামনে দাঁড়ালাম। চিন্তিত গলায় বললাম, মা কোনো সমস্যা?

মা বললেন তোর বাবা গাড়ি কিনেছে। ক্রিম কালারেরে গাড়ি। ৯ টার সময় ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসবে। ড্রাইভারের নাম ইসমাইল। কী কাণ্ড দেখেছিস? তোর বাবা গাড়ি কিনে ফেলেছে। আল্লা গো আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। টগরকে ডেকে তুলে গাড়ি কেনার কথা বল। এত বড় একটা ঘটনা, সে ঘুমাচ্ছে এটা কেমন কথা। রহিমার মাকেও ডেকে তোল। সে শুনলে খুশি হবে।

ভাইয়াকে বাবা নিজেই ডেকে তুললেন। গম্ভীর গলায় বললেন, তুই ইঞ্জিনিয়ার মানুষ গাড়ির কলকব্জার কি অবস্থাদেখে নে।

ভাইয়া বলল, কিসের কলকব্জা দেখব?

গাড়ির। একটা গাড়ি কিনেছি।

ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, খামাখা গাড়ি কিনেছ কেন?

বাবা হতাশ গলায় বললেন, গাড়ির প্রয়োজন আছে এই জন্য কিনেছি। আমার তো নানা জায়গায় যেতে হয়। তোর মতো বিছানায় শুয়ে থাকলে হয় না।

ভাইয়া বলল, তুমি শুধু ইউনিভার্সিটি যাও সেখান থেকে বাসায় আস। তোমার জন্য রিকশাই যথেষ্ট।

নতুন গড়ির প্রতি ভইয়ার অনাগ্রহ মা পুষিয়ে দিলেন। তার বয়স পাঁচ বছর কমে গেল। গলার স্বরে কিশোরী ভাব চলে এল। আমাকে আহ্লাদি গলায় বললেন, তোর বাবা বলেছেন আমাকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাবে। শারী কোনটা পরবো বল তো। বিয়ের শারীটা পরবো?

পরতে পারো। বাবাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে শেরোয়ানি পাগড়ি পরিয়ে দাও।

মা বললেন, ঠাট্টা করিস না। চট করে যা মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে নিয়ে আয়, নতুন গাড়িতে দোয়া বখশে দেবেন।

ইমাম বাইরে থেকে আনতে হলো না, গাড়ির সঙ্গেই চলে এলেন। গাড়ির ড্রাইভার ইসমাঈল দেখে মনে হলো দেওবন্ধ মাদ্রাসার শিক্ষক। হাঁটুর গোড়ালির ওপর পায়জামা। সবুজ পাঞ্জাবিও হাঁটু ছাড়িয়ে অনেক দূর নেমে গেছে। মুখ ভর্তি চাপ দাড়ি। চোখে সুরমা। নামাজ পরে কপালে স্থায়ী দাগ ফেলে দিয়েছেন। ভাইয়া হুড খুলে গাড়ির ইঞ্জিন পরিক্ষা করে বলল, ইঞ্জিন তার জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। যেকোনো দিন ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে ইন্তেকাল করবে। এই যে বসবে আর উঠবে না। বাবা কী মনে করে এই আবর্জনা কিনল।

ড্রাইভার ইসমাইল বলল, ইঞ্জিন খুব ভালো অবস্থায় আছে ভাইজান। বাঘের বাচ্চা ইঞ্জিন।

ভাইয়া বলল, বাঘের বাচ্চা হলে খুবই ভালো কথা। হালুম হালুম করে গাড়ি চলবে, মন্দ কি।

বাবা এবং মা (বিয়ের শারী পরে) বাঘের বাচ্চা ইঞ্জিনের গাড়িতে করে বের হলেন। রহিমার মা ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে তাঁদের সঙ্গে গেল। সে বসল ড্রাইভারের পাশে। তার গাম্ভীর্য দেখার মত। তার হাতে টকটকে লাল রঙের ভ্যানিটি ব্যাগ। দুই ঘন্টা রিক্সা করে

তারপর ভাড়া করে সিএনজিতে তিনজন ফিরল। তিনজনেরই মুখ গম্ভীর। রহিমার মা চোখে পানি। বাবার নতুন কেনা গাড়ির ইঞ্জিন বসে গেছে। ড্রাইভার ইসমাইল গাড়ি ঠেলে নিয়ে গেছে গ্যারেজে।

যাই হোক বাঘের বাচ্চা ইঞ্জিন ঠিক করা হয় নি। যে টাকায় বাবা তার ইউনিভার্সিটির প্রক্টরের কাছ থেকে গাড়ি কিনেছেন, তার কাছাকাছি টাকা লাগছে ইঞ্জিন সারতে। এই টাকা বাবার কাছে নেই। গাড়ি এখন বাসায়। ড্রাইভার ইসমাইল রোজ এই গাড়িকে ঝাঁড়-পোছ করে। সপ্তাহে একদিন গাড়ির গোসল হয়। নিজের টাকায় সে একটা এয়ারফ্রেশনার কিনে গাড়িতে লাগিয়েছেন। নষ্ট গাড়ি আমাদের বাসায় মহা যত্নে আছে। রহিমার মাকে প্রায়ই সেজেগুজে নষ্ট গাড়ির পেছনের সিটে বসে থাকতে দেখা যায়।

এখন গাড়ির ড্রাইভার ইসমাইল সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে মূল গল্পে চলে যাব।

ইসমাইল

আমাদের সাম্প্রতিক অন্তর্ভুক্ত পারিবারিক সদস্যের একজন ইসমাইল। বাড়ি নেত্রকোনার ধুন্দল গ্রামে। শ্যাওরাপাড়া থানা। অতি ধার্মিক। ফজরেরে নামাজের পর কোরান পাঠ দিয়ে সে দিন শুরু করে। কোনো নামাজের ওয়াক্তে আজান না দিলেও সে মাগরিবের আজান দেয়। প্রায়ই শোনা যায় সে রোজা।

বাসার কিছু কাজকর্মে সে সাহায্য করে। যেমন বাজার করা, উঠান ঝাঁট দেয়া। টবে পানি দেয়া। তার একটি কর্মদক্ষতায় ভাইয়া মুগ্ধ। ইসমাইল একাই একটা মুরগি জবেহ করতে পারে। দুই হাঁটুতে মুরগির পা চেপে ধরে এই কাজটি সে করে।

রহিমার মা ইসমাইলের কর্মকান্ড নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছে। ভাইয়ার সাথে এই বিষয়ে সে মতবিনিময়ও করে। যেমন একদিন শুনলাম, সে ভাইয়াকে বলছে, লোকটা ভাবের মধ্যে আছে। মেয়েছেলে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে। মাথা ঘুরিয়ে নেয়।

ভাইয়া বলল, মওলানা মানুষ এটাই তো স্বাভাবিক।

রহিমার মা বলল, থুন ফালায়া কত মওলানা দেখলাম। ইশারার অপেক্ষা। ইশারা পাইলেই ফাল পাড়ব।

ইশারা দিচ্ছ না?

সময় হোক, সময় হইলেই দিব। তখন দেখা যাবে কত বড় মুন্সি।

ইশারাটা দিবে কীভাবে?

সব তো আপনারে বলবো না। একেক জনের জন্য একেক ইশারা। আপনার জন্য যে ইশারা খাটবে, মুন্সির জন্য সেটা খাটবে না।

ভাইয়া আগ্রহ নিয়ে বলল, আমাকে একবার একটা ইশারা দিও তো, দেখি ঘটনা কী?

আমাদের সংসারের চাকা এভাবেই ঘুরছে। বাবা ক্লাসে যাচ্ছেন, ফিরে আসছেন। রহিমার মা নষ্ট গাড়ির দরজা খুলে পেছনের সিটে বসে থাকছে। সন্ধ্যা বেলায় ড্রাইভার ইসমাইল কলপাড়ে দাঁড়িয়ে আজান দিচ্ছে। ভাইয়া বই উল্টা করে পড়ছে। রহিমার মা অপেক্ষায় আছে ইশারার। এমন সময় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল।

সকাল ১১টা। বাবা কাজে চলে গেছেন। রহিমার মা ঘর ঝাঁট দিচ্ছে এবং নিজের মনে কথা বলছে। তার মন-মেজাজ খারাপ থাকলে অনর্গল নিজের মনে কথা বলে। মায়ের ঘর থেকে টিভির আওয়াজ আসছে। বাবা অফিস যাওয়ার পরপর মা একটা হিন্দি সিনেমা ছেড়ে দেন। রহিমার মা কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু-তিন মিনিট করে দেখে।

ভাইয়া চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার হাতে উল্টা করে ধরা বই। ভাইয়া উল্টা করে বই পড়লে ধরে নিতে হবে তারও মন খারাপ। ভাইয়া বই নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, ‘কুতো বিদ্যার্থিনঃ সুখম।’

আমি বললাম, এর মানে কী?

ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, বিদ্যাশিক্ষার্থী মানুষের মনে সুখ নাই।

সাংস্কৃত কোথায় শিখলে?

কোথায় শিখেছি সেটা ইম্পরট্যান্ট না। কিছু বলতে পারছি এটা ইম্পরট্যান্ট। ধর্মপ্রচারকদের বিভিন্ন সময় নানান ভাষায় কোটেশন দেবার ক্ষমতা থাকতে হয়।

তুমি ধর্ম প্রচার করছ?

হুঁ। ভালোবাসার বিপরীত শব্দ কী, বল দেখি।

ঘৃণা।

আমার ধর্মের মূল বিষয় হচ্ছে ঘৃণা। এই ধর্মে সবাই একে অন্যকে ঘৃণা করবে।

তোমার ধর্মের নাম কী?

রগট ধর্ম। টগর উল্টা করে হয়েছে রগট। রগট ধর্ম তিন স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো।

১.ঘৃণা

২.হিংসা

৩.বিদ্বেষ

এই ধর্মের মানুষদের সপ্তাহে একটা মন্দ কাজ করতে হবে। নয়তো তার ধর্মনাশ হবে। আমি ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। সে ফাজলামি করছে কি না, এখনো বুঝতে পারছি না। ভাইয়া অবশ্য ফাজলামি করা টাইপ না। তার মাথায় কিছু একটা নিশ্চই খেলছে। ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, একটা কাজ করে দিতে পারবি?

আমি বললাম, কী কাজ বলো।

একটা মেয়ের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। মেয়েটাকে এবং মেয়ের মাকে নিয়ে আসবি। তারা এখন থেকে এ বাড়িতে থাকবে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করেছ?

বাবাকে জিজ্ঞেস করবো কোন দুঃখে? বাবা বাড়িতে এসে দেখবেন তার একটা গেস্টরুম দখল হয়ে গেছে। তার চোখ কপালে উঠে যাবে। দর্শনীয় ব্যাপার হবে।

যাদের আনতে চাচ্ছ তারা কে?

মেয়েটার নাম পদ্ম। পদ্মর মায়ের নাম ভুলে গেছি। পদ্মকে চিনিস না?

হুঁ, বিড়াল কন্যা।

বিড়াল কন্যা এখন সিংহের মুখের সামনে। তাকে উদ্ধার করা জরুরী।

আমি বললাম, ঠিকানা দাও। নিয়ে আসছি।

ভাইয়া বলল, গুড বয়।

আমি বললাম, তাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে?

হুঁ, বাবা মাঝেমধ্যে কিছু টাকা দেন আমি নিয়ে যাই। কাজটা বাবা করেন অপরাধবোধ থেকে। এই বাড়ির অর্ধেকটা ওদের।

তুমি নিশ্চিত?

অবশ্যই, বাবা এমন কোনো দয়ালু মানুষ না যে ওদের দুর্দশা দেখে টাকা পাঠাবেন। তার হচ্ছে হিসাবের পয়সা। ওদের এ বাড়িতে এনে তোলার পরের ব্যাপারটা ভেবেছ?

না। আমি বর্তমানে বাস করি-অতীতে না, ভবিষ্যতেও না।

তোমার কর্মকান্ড তো রগট ধর্মের সঙ্গে যাচ্ছে না। তুমি পদ্ম ও তার মাকে দয়া করছ। ভালো কাজ করছ। রগটরা কি এই কাজ করতে পারে?

ভাইয়া হাসতে হাসতে বলল, দয়া দেখাচ্ছি তোকে কে বলল? এরা এ বাড়িতে এসে উঠলেই ধুন্দুমার লেগে যাবে। বাবা আধপাগলের মতো হবেন। মা ঘন ঘন মুর্ছা যাবেন। আমার রগট ধর্ম এই জিনিসটাই চায়। ঝামেলা, সন্দেহ, ঈর্ষা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। আমি বললাম , সিএনজি ভাড়া দাও। সিএনজিতে করে নিয়ে আসি।

ভাইয়া উঠে বসতে বসতে বলল, ব্যাপারটা এত সহজ না। পদ্ম মেয়েটা আছে মহাবিপদে। আজ তাকে জোর করে বিয়ে দেয়া হচ্ছে। তুই একা কিছু করতে পারবি না। তোকে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। তোর সঙ্গে লোকজন যাবে। ওরাই ব্যাবস্থা করবে। এখন বাজে কয়টা?

এগারোটা বিশ।

তুই অপেক্ষা কর। বারোটার মধ্যে দলবল চলে আসবে। ওদের সঙ্গে যাবি। রহিমার মাকে বল, আমাকে চা দিতে।

ভাইয়া আবার শুয়ে পা নাচাতে লাগল। তাকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। রগট ধর্মের মানুষদের উৎফুল্ল থাকার বিধান কি আছে?

সন্দেহজনক চেহারার কিছু লোকজন মাইক্রোবাসে বসা। এদের একজন আবার ইসমাইলের মত মওলানা। বিশাল দাড়ি। সেই দাড়ি মেন্দি দিয়ে রাঙ্গানো। মওলানার মাথায় জরির কাজ করা লাল টুপি। তাঁর শারীরিক কিছু সমস্যা আছে। কিছুক্ষন পর পর তিনি

শরীর কাঁপিয়ে হোঁৎ ধরনের শব্দ করেন। মাওলানা বসেছেন ড্রাইভারের পাশে। তিনি ক্রমাগত তসবি টেনে যাচ্ছেন। তাঁর গা থেকে কড়া আতরেরে গন্ধ আসছে।

আমি দুজনার মাঝখানে বসে আছি। ডান পাশের জনের পান-খাওয়া হলুদ দাঁত। এ-ই মনে হয় দলটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি। সবাই তাকে 'ব্যাঙা ভাই' ডাকছে। ব্যাঙা কারো নাম হতে পারে, তা-ই আমার ধারনা ছিল না। ব্যাঙা ভাই বেঁটেখাটো মানুষ। হাসিখুশি স্বভাব। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয় খাইছেন না কি, ভাই?

আমি বললাম, ভয় কোনো খাওয়ার জিনিস না। ভয় হচ্ছে পাওয়ার জিনিস। আমি ভয় পাচ্ছি না।

ব্যাঙা ভাই বললেন, ঘটনা মালেক গ্রুপের হাতে চলে গেছে, এটাই সমস্যা। মালেক গ্রুপ না থাকলে পুরো বিষয় ছিলো পান্তা ভাত।

আমি বললাম, মালেক গ্রুপ ব্যাপারটা কী?

মালেকের দল। মালেক হলো ট্রাক মালিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ। এটা ওনার বাইরের পরিচয়। ভেতরেরে পরিচয় ভিন্ন। বিরাট ডেঞ্জার লোক। তবে উনি আমারে খাতির করেন। সে জানে ব্যাঙা সহজ জিনিস না।

আপনি কঠিন জিনিস?

অবশ্যই।

টগর ভাইয়ার সঙ্গে আপনার পরিচয় কীভাবে?

সে এক ঘটনা। আরেক দিন শুনবেন। টেনশনের সময় গল্পগুজবে মন বসে না।

আপনার টেনশান হচ্ছে?

মালেকের গ্রুপ, টেনশান হবে না? বিপদের সময় আমি সঙ্গে মাওলানা রাখি। মাওলানা দোয়া-খায়ের করতে থাকে, যেন বিপদ হালকা হয়। অল্পের উপর দিয়ে যায়। আজ মনে হয় অল্পের ওপর দিয়ে যাবে না। বাতাস খারাপ।

আগারগাঁওয়ের এক বস্তির কাছে মাইক্রোবাস থামল। মাওলানা আর আমাকে রেখে ব্যাঙা দলবল নিয়ে চলে গেল। ড্রাইভার তাঁর সিটে বসা। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ম। ব্যাঙা যেদিকে গিয়েছে, ড্রাইভার সে দিকেই তাকিয়ে আছে। সেও নিশ্চয়ই এই দলের সঙ্গে যুক্ত।

সামনের দিক থেকে একটা ইয়োলো ক্যাব এসে মাইক্রোবাসের পাশে থামল। সাফারি গায়ে মোটাসোটা একজন নামল। কিছুক্ষণ মাইক্রোবাসের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বস্তির ভিতর ঢুকে গেল।

মাইক্রোবাসের ড্রাইভার বলল, হাওয়া গরম, শামসু চলে আসছে।

আমি বললাম, শামসু কে?

ভেজালের জিনিস। শামসু আছে আর ভেজাল হয় নাই এমন কোনো দিন ঘটে নাই।

কী রকম ভেজাল?

লাশ পড়ে যায়। এই হলো ভেজাল।

আমি হতভম্ব। ঘটছেটা কী? ড্রাইভার বলল, ভাইজান আপনে ভয় খায়েন না। বিপদ দেখলে গাড়ি টান দিব। আপনেরে বিপদের বাইরে রাখার নির্দেশ আছে।

অডার কে দিয়েছে? টগর ভাই?

ড্রাইভার মধুর ভঙ্গিতে হাসল। আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, সিগারেট ধরান। সিগারেটের ধোঁয়া টেনশানের আসল ওষুধ।

আমি সিগারেট খাই না।

খান না ভাল কথা। আজ খান। দেখেন, টেনশান ক্যামনে কমে। টেনশানে গাঁজা খেলে টেনশান বাড়ে। সিগারেট-গাঁজা দুটাই ধোঁয়া, কাজ দুই রকম।

ড্রাইভার সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল। আমি সিগারেট ধরিয়ে কাশতে কাশতে বললাম, আপনি তো খাচ্ছেন না।

টেনশান নাই, খামাখা সিগারেট খাব কেন?

গাড়ি থেকে বস্তির জীবন যাত্রা স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। বড় কিছু ঘটেছে এমন কোনো আলামত দেখতে পাচ্ছি না। আধা নেংটা ছেলেপুলে হুটোপুটি করছে। সাইকেলের চাকা নিয়ে খেলছে। খেলার উত্তেজনা ছাড়া এদের মধ্যে বাড়তি কোনো উত্তেজনা নেই। কালো মাটির হাঁড়ি নিয়ে একজন চাক ভাঙা মধু বিক্রি করছে। বস্তির মহিলাদের কেউ কেউ দরদাম করে কিনছে। মধুর সঙ্গে তারা চাকের একটা অংশও পাচ্ছে। এক বৃদ্ধকে দেখা গেল গাই দুয়াচ্ছে। গ্রাম বাংলার খানিকটা উঠে এসেছে।

মাইক্রোবাসের পাশে জিন্সের প্যান্ট ও কলারওয়ালা গেঞ্জি পরা মধ্যবয়স্ক এক লোক এসে দাঁড়াল। তার গেঞ্জিতে অ আ ক খ লেখা। ফেব্রুয়ারি মাসের গেঞ্জি এপ্রিল মাসে পরে এসেছে। নীলগেঞ্জি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে ডাকে। আসেন আমার সঙ্গে।
আমি কিছু বলার আগেই ড্রাইভার বলল, কে ডাকে?
শামসু ভাই ডাকে।
শামসু ভাই ডাকলে উনি অবশ্যই যাবেন। কিন্তু শামসু ভাই যে ডাকে, সেটা বুঝব ক্যামনে? ওনাকে এসে ডেকে নিয়ে যেতে বলেন।
এটা সম্ভব না। ওনারে আমার সঙ্গে যেতে হবে। এক্ষণ গাড়ি থেকে নামতে বলেন।
ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলল, উনি গাড়ি থেকে নামতে পারবেন না। ওনার পায়ে সমস্যা। ওনারে কি কোলে করে নিতে পারবেন? কোলে করে নিতে পারলে কোলে উঠায়ে নিয়ে যান।
বলতে বলতেই ড্রাইভার গাড়ির এক্সেলেটরে চাপ দিল। নীলগেঞ্জি লাফ দিয়ে সরল। আমরা

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফার্মগেটে চলে এলাম। তাজ রেস্টুরেন্ট নামের এক রেস্টুরেন্টের সামনে এখন গাড়ি থেমে আছে। ড্রাইভার বলল, ভাইজান, চাকফি কিছু- খাবেন? এরা ভালো কফি বানায়।

ড্রাইভারের কথায় কোনো টেনশন নেই। হুট করে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে আসা যেন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

মাওলানা বললেন, গোশত-পরোটা খাব, ভুখ লাগছে।

আমরা গোশত-পরোটা খেলাম। কফি খেলাম। ড্রাইভার বলল-মোবাইলে কল পাওয়ার পরে যাব। মামলা ফয়সালা হতে সময় লাগবে। আমাদের দলে লোক কম, এইটাই সমস্যা। এক ব্যাঙা ভাই কয় দিক দেখবে!

মাওলানা বললেন, কথা সত্য। একজনের ওপর অত্যধিক চাপ।

সন্ধ্যা মিলাবার পর আমাদের যেতে বলা হলো। আমরা উপস্থিত হবার কিছুক্ষণের মধ্যে কালো বোরকায় ঢাকা একজনকে নিয়ে ব্যাঙা ভাই উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে আরও লোকজন আছে। ব্যাঙা ভাই হাসিমুখে বললেন, স্বামীদিতে স্ত্রীর মিলন ঘটায়ে- পেরেছি, এতেই আমি সুখী। বড় একটা সোয়াবের কাজ হয়েছে। স্বামী থাকা অবস্থায় অন্যের সঙ্গে বিবাহ হলে আল্লাহর গজব পড়ত।

মাওলানা ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন। ব্যাঙা ভাই মাওলানার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ‘ইনিই এদের বিয়ের কাজি ছিলেন। এদের বিয়ে উনি পড়িয়েছেন। পাঁচ লাখ টাকা দেনমোহরে বিবাহ। অর্ধেক উসুল। ঠিক না, কাজি সাহেব?’

মাওলানা বললেন, সামান্য ভুল করেছেন। দেনমোহর ছিল চার লাখ।

আমার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় করানো হলো। ব্যাঙা ভাই আমার হাত ধরে বললেন, ইনি পদ্মের স্বামী। আমার ওস্তাদের ছোট ভাই। দামান (জামাই), সবাইরে আসসালামু আলায়কুম দেন।

আমি বললাম, আসসালামু আলায়কুম।

সবাই গম্ভীর হয়ে গেল। কেউ সালামের উত্তর দিল না।

ব্যাঙা ভাই তাঁর দল নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। রাজনৈতিক নেতাদের মতো হাত নাড়ালেন।

মাইক্রোবাস চলতে শুরু করল। ব্যাঙা ভাই তৃপ্তির গলায় বললেন, বিরাট ঝামেলা লেগে গিয়েছিল। শামসু ভাইকে দেখলাম প্যান্টের পকেটে হাত দিল। আমি বললাম, শামসু ভাই যন্ত্রপাতি শুধু আপনার আছে! অন্যের নাই এ রকম মনে করবেন না। আমার ওপর ওস্তাদের অর্ডার, মেয়ে নিয়ে যেতে হবে।

শামসু বলল, আপনার আবার ওস্তাদ আছে নাকি?

আমি বললাম, তারা চলাফিরার পথে ওস্তাদকে সালাম দেয়। রাস্তাঘাটে যে পিপীলিকা চলাফেরা করে তাদেরও ওস্তাদ থাকে, তাদের যদি ওস্তাদ থাকে, আমার কেন থাকবে না?

মাইক্রোবাস ফার্মগেটের তাজ হোটেলে গেল। ব্যাঙা ভাই আমার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, আপনি এখান থেকে সিএনজি নিয়ে চলে যান। মাইক্রোবাস নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

বোরকাওয়ালি বোরকা খুলেছে। 'অধিক শোকে পাথর' কথাটি সে সত্যি প্রমাণ করেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে মৃত মানুষ। আমি বললাম, পদ্ম, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ?

সে জবাব দিল না, আমার দিকে তাকালও না।

আমি বললাম, খুব ছোটবেলায় তুমি তোমার মাকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসেছিলে। হাতে একটা কঞ্চি নিয়ে বিড়াল তাড়াচ্ছিলে। তোমার কি মনে আছে?

পদ্ম মৃদু গলায় কী যেন বলল। বড় বড় করে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে মাথা ঘুরে গাড়ির সিট থেকে নিচে পড়ে গেল। আমি তাকে তুলতে গিয়ে প্রথম লক্ষ করলাম, জ্বরে তার শরীর পুড়ে যাচ্ছে।

পদ্মর মা আমাদের বাসায় চলে এসেছেন। সঙ্গে একটা সুটকেস, দুটা বড় বড় কাগজের কার্টনে তাঁর সংসার। এই মহিলাকে আনানোর ব্যবস্থা ভাইয়া আলাদাভাবে করেছেন। মহিলা মেয়েকে দেখে আনন্দে পুরো পাগল হয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'পদ্ম ও পদ্ম, তাকিয়ে দেখ আমি তোর মা। তোর আর কোনো ভয় নাই। তাকিয়ে আমাকে একটু দেখ, লক্ষ্মী মা।' এই মহিলারও মনে হয় মেয়ের মতো মূর্ছাব্যাধি আছে। কিছুক্ষণ হইচই করে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

পদ্ম জ্বরে অচেতন। সে কিছুই তাকিয়ে দেখছে না। তবে আমার বাবা ও মা তাকিয়ে দেখছেন। বাবা বাসায় এসেছেন কিছুক্ষণ আগে। ঘটনা এখনো হজম করে উঠতে পারেননি। হজম করার কথা না। বাবা চোখের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি কিছুই ঘটেনি ভাব নিয়ে কাছে গেলাম।

বাবা বললেন, মা-মেয়েকে তুমি এনেছ?

আমি বললাম, আমি মেয়েটাকে এনেছি। তার মায়ের বিষয়ে কিছু জানি না। ভাইয়া জানতে পারে। ভাইয়াকে ডাকব?

আগে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তারপর ভাইয়া। মেয়েকে কোত্থেকে এনেছ?

আগারগাঁওয়ে একটা বস্তি আছে, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে জোর করে এক ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

সমাজের হিত করার চেষ্টা?

হ্যাঁ।

অভিযানে বের হচ্ছ এই বিষয়টা আমাকে জানানোর প্রয়োজনও বোধ করলে না?

গোপন অভিযান তো বাবা, কাউকে জানানো যাচ্ছিল না।

তোমার ভাইয়াকে আমার শোবার ঘরে আসতে বলো।

আমিও কি সঙ্গে আসব?

আসতে পারো।

রাত আটটা দশ। আমরা বাবার শোবার ঘরে। লোডশেডিং চলছে বলে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। মায়ের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। আমরা দুই ভাই তাঁর পায়ের কাছে খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছি। ভাইয়া পা দোলাচ্ছেন। আমি দোলাচ্ছি না।

বাবা আমাদের থেকে সাত-আট ফুট দূরে একটা প্লাস্টিকের লাল চেয়ারে বসেছেন। তিনি জাজসাহেব ভাব ধরার চেষ্টা করছেন। মোমবাতির রহস্যময় আলোর জন্যে তাঁর জাজসাহেব ভঙ্গিটা ফুটছে না। তাঁকে বরং অসহায় লাগছে।

বাবা ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, টগর, তোমার কিছু বলার আছে?

ভাইয়া পা দোলাতে দোলাতে বলল, না।

এত বড় ঘটনা তোমরা দুই ভাই মিলে ঘটালে, এখন বলছ তোমাদের কিছু বলার নেই?

ভাইয়া বলল, আমি বলেছি আমার কিছু বলার নেই। মনজুর বলার কিছু আছে কি না সেটা সে জানে। আমার জানার কথা না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমার কিছু বলার নেই, বাবা।

বাবার মধ্যে দিশাহারা ভাব দেখা গেল। তিনি কোন দিক দিয়ে এগোবেন তা বুঝতে পারছেন না। ভাইয়া বলল, বাবা, আমি উঠি। পদ্ম মেয়েটার অনেক জ্বর। ওকে ডাক্তার দেখাতে হবে কিংবা হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে।

বাবা বললেন, তোমার মায়েরও তো ঘটনা দেখে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। তাকেও তো হাসপাতালে ভর্তি করাতে হতে পারে।

ভাইয়া বলল, মাকে ভর্তি করাতে হলে ভর্তি করাব। পদ্ম আর মা পাশাপাশি দুই বেডে শুয়ে থাকল।

বাবা হঠাৎ গলার স্বর কঠিন করে বললেন, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারপর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। তুমি কোন সাহসে মা-মেয়েকে এখানে এনে তুললে?

ভাইয়া বলল, সাহস দেখানোর জন্যে এখানে আনিনি বাবা। মানবিক কারণে এনেছি। ওরা ভয়ংকর অবস্থায় পড়েছিল। সেখান থেকে উদ্ধার পেয়েছে। তা ছাড়া এই বাড়ির অর্ধেকের মালিক তো তারা।

তার মানে?

পদ্মর বাবা অনেক কষ্ট করে জমি কেনার অর্ধেক টাকা দিয়েছিলেন। বেচারা মারা যাওয়ায় আপনার জমি দখলের সুবিধা হয়েছে।

তুমি বলতে চাচ্ছ, আমি অন্যায়ভাবে একজনের টাকা মেরে দিয়েছি?

হুঁ।

কী কারণে এই ধারণা হলো?

ঘটনা বিশ্লেষণ করে এ রকম পাওয়া যাচ্ছে, বাবা।

ঘটনা বিশ্লেষণ করে ফেলেছ?

হুঁ। তুমি পাপ করেছ, তার ফল ভোগ করছ।

কী ফল ভোগ করেছি?

দুই অপদার্থ পুত্রের জন্ম দিয়েছ। তোমার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 'মুরগি' নামে খ্যাতি লাভ করেছ। আরও শুনবে?

বাবা চোখমুখ শক্ত করে রাখলেন। ভাইয়া বলল, আরেকটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি, বাবা? তালাবদ্ধ ঘরে একজন বৃদ্ধ ভূত থাকে বলে মার ধারণা। ভূতটা খক খক করে কাশে। মার দৃঢ়বিশ্বাস, এই ভূতটা পদ্মর বাবা। তিনি জমির টানে এখানে নাজেল হয়েছেন। ভূত ঠান্ডা রাখার প্রয়োজন আছে। এখন তিনি আর কাশবেন না। খড়ম পায়ে হেঁটে মাকে ভয়ও দেখাবেন না।

বাবা ইংরেজিতে একটা দীর্ঘ গালি দিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। তাঁর গালি ইংরেজিতে হওয়ারই কথা। বাবার গালির বাংলা ভাষ্য হলো–এই কুকুরিপুত্র। ঘর থেকে এই মুহূর্তে বিদায় হ। আর যেন তোকে না দেখি।

গালি শুনে ভাইয়া সুন্দর করে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী'। এর অর্থ হলো, অন্তকাল ও বিশাল পৃথিবী রহিয়াছে।

বাবার ঘর থেকে আমরা দুই ভাই চলে আসছি। বাবা পেছন থেকে স্যান্ডেল ছুড়ে মারলেন। ভাইয়া আগে আগে যাচ্ছিলেন বলে স্যান্ডেল তার গায়ে লাগল না। আমার গায়ে লাগল। দৃশ্যটা দেখল রহিমার মা। সে আমকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, পিতামাতার হাতে স্যান্ডেলের - পার। যে জায়গায়বাড়ি খাওয়া বিরাট ভাগ্যের ব্যা বাড়ি পড়ছে, সেই জায়গা বেহেশতে যাবে। পদ্ম এবং তার মা এ বাড়িতে আছে দশ দিন ধরে। পদ্মর মায়ের নাম সালমা। ভাইয়া তাকে ডাকছে 'ছোট মা'। আমি ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, ওনাকে ছোট মা ডাকছ কেন? ভাইয়া উদাস গলায় বলল, ঝামেলা লাগানোর জন্যে 'ছোট মা' ডাকছি, রগট ধর্মের অনুসারীরা ঝামেলা লাগাবে–এটাই তো স্বাভাবিক। আমার 'ছোট মা' ডাক শুনে বাবা আগুনলাগা মরিচবাতির মতো বিড়বিড় করে জ্বলবেন। মা ঘন ঘন ফিট হবেন। মজা না? দেখ, কেমন ঝামেলা লাগে।

ঝামেলা ভালোমতোই লেগেছে। পদ্মপরিবারের দশ দিন পার করার পর আমাদের সবার -

গতি ও অবস্থান জানানো যেতে পারে, যদিও কোনো কিছুরই গতি ও অবস্থান একসঙ্গে জানা যায় না। গতি জানলে অবস্থান বিষয়ে কিছু অনিশ্চয়তা থাকে, আবার অবস্থান জানলে গতির অনিশ্চয়তা। এসব জ্ঞানের কথা ভাইয়ার কাছ থেকে শোনা।

বাবা

তাঁর উঠানে চক্রাকার হণ্ঠন এবং ফ্রিহ্যান্ড একসারসাইজ এই কদিন বন্ধ। ভাইয়ার সঙ্গে তিনি কয়েকটা গোপন বৈঠক করেছেন। তাঁদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, জানি না। ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভাইয়া কিছু বলেনি, শুধু মধুর ভঙ্গিতে হেসেছে।
বাবার সঙ্গে আমার একবারই কথা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন, তোমার বড় ভাই পদ্মর মাকে ছোট মা ডাকছে কেন?
আমি জানি না, বাবা।
তুমি কী ডাকো?
ওনার সঙ্গে আমার এখনো কোনো কথা হয়নি বলে কিছু ডাকার প্রয়োজন হয়নি।
প্রয়োজন হলে কী ডাকবে?
তুমি যা ডাকতে বলবে, তা-ই ডাকব। নাম ধরে ডাকতে বলেল, সালমা ডাকব।
তোমার বড় ভাইকে আমি মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় দিয়েছি, এটা জানো?
না।
মঙ্গলবার দুপুর বারোটার মধ্যে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।
ভাইয়া রাজি হয়েছে?
তার রাজি হওয়া-হওয়ির কী আছে? দিস ইজ মাই হাউস। তুমি যদি মনে করো তুমি তোমার ভাইয়ার সঙ্গে চলে যাবে, তুমিও যেতে পারো।
জি আচ্ছা, বাবা।
বিএ পাস করে ঘরে বসে আছো কেন? নড়াচড়া করবে না?
চাকরি খুঁজছি, বাবা। একটা মনে হয় পেয়েও যাব। ইন্টারভ্যু ভালো হয়েছে।

কী চাকরি?

শকুনশুমারির চাকরি। একটা এনজিওর সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় ফাইনাল হয়ে গেছে। এনজিওর কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের শকুনের পরিসংখ্যান করা।

ফাজলামি করছ?

জি না, বাবা। এনজিওর নাম Save the vulture. বাংলায় 'শকুন বাঁচাও'।

বাবার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি মরিচবাতির মতো জ্বলছেন।

মা

মা পুরোপুরি শয্যা নিয়েছেন। আগে তাঁর হাঁপানি গ্যাপ দিয়ে দিয়ে হতো, এখন মেগাসিরিয়ালের মতো প্রতিদিনই হচ্ছে। হাঁপানির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাশি। সারাক্ষণই খক খক। মা ঘন ঘন আমাকে ডেকে পাঠান এবং ঘণ্টাখানেক কথা বলে নেতিয়ে পড়েন। প্রতিদিনই কথা শুরু হয় কাক দিয়ে এবং শেষ হয় পদ্মর মা দিয়ে।

মনজু, শোন। যেদিন ওই হারামজাদা কাকটা মানুষের চোখ ঠোঁটে নিয়ে বারান্দায় এসে বসেছে, সেদিনই বুঝেছি আমার সব শেষ।

মা, তুমি শোনো! মানুষের চোখ ওই কাক কোথায় পাবে? মরা গরু-ছাগলের চোখ নিয়ে এসেছে। ওইটা ছিল মানুষের চোখ। গরু-ছাগলের চোখ আমি চিনি। আমি কচি খুকি না। এখন বল, টগর কেন পদ্মর মাকে ছোট মা ডাকে?

জানি না, মা।

আমার মনে সন্দেহ, তোর বাবা ওই মহিলাকে গোপনে বিয়ে করেছে। টগর বিষয়টা জানে বলে তাকে ছোট মা ডাকে।

হতে পারে।

হতে পারে না, এইটাই ঘটনা। টগর চিন্তাভাবনা ছাড়া কিছু করে না। সারা জীবন ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া ছেলে। ছোট মা ডাকা উচিত বলেই সে তাকে ছোট মা ডাকছে।

এখন, মা, আমিও কি ওনাকে ছোট মা ডাকব?

কথাবার্তার এই পর্যায়ে মায়ের হাঁপানির টান প্রবল হলো। তিনি ডাঙার বোয়াল মাছের মতো একবার হাঁ করছেন, একবার মুখ বন্ধ করছেন।

একজন খাবি-খাওয়া মানুষের পাশে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। আমি উঠে পড়লাম। মা বললেন, যাচ্ছিস কোথায়? বসে থাক। টগরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারবি তোর বাবা ওই মহিলাকে বিয়ে করেছে কি না।

তুমি সরাসরি বাবাকে জিজ্ঞেস করো।

তোর বাবাকে এ রকম একটা কথা কীভাবে জিজ্ঞাসা করব?

ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করো। বাংলা ভাষা আমাদের কাছে খোলামেলা, ইংরেজির আব্রু আছে। ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে বাবা খুশিও হবেন। তুমি বললে, 'Is it true that you got married to Salma?'

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, একটা কাগজে লিখে দে। আমার মনে থাকবে না।

ভাইয়া

বাবা উঠানে চক্রাকারে ঘোরা বন্ধ করেছেন বলেই হয়তো ভাইয়া শুরু করেছে। প্রতি সন্ধ্যায় সে এই কাজ করছে। রাতে সে তার রগট ধর্ম নিয়ে খাতায় কী সব লিখছে! লিখছে উল্টা করে, কাজেই সরাসরি পড়ার উপায় নেই। আয়নার সামনে ধরে পড়তে হয়। একজন মানুষ পাতার পর পাতা উল্টা করে লিখে যাচ্ছে, এই ঘটনা বিস্ময়কর।

ব্যাঙা ভাই একদিন এসেছিল। অনেকক্ষণ ভাইয়ার সঙ্গে গুজগুজ করল। আমি আড়াল থেকে শুনলাম।

ওস্তাদ, দুই-একটা ভালো কথা বলেন, শুনি।

কোন বিষয়ে কথা শুনতে চাও?

আপনার যা ইচ্ছা বলেন।

শত্রু বিষয়ে বলব?

বলেন, শুনি।

একজন মানুষের মহা শত্রু হলো ঋণগ্রস্ত পিতা। সংস্কৃতে এই জন্যেই বলে ‘ঋণগ্রস্ত পিতা শত্রু’।

বলেন কী! জন্মদাতা পিতা শত্রু?

‘কান্তা রূপবতী স্ত্রী শত্রু’, অর্থাৎ, রূপবতী স্ত্রী শত্রু।

খাইছে আমারে! আমি পয়েন্টে পয়েন্টে ধরা খাইতেছি।

‘পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ’। অর্থাৎ, মূর্খ পুত্রও শত্রু।

আমি গেছি ওস্তাদ, আমার চাইর দিকেই শত্রু। কাশেমের মা পরির চেয়েও সুন্দর। আর কাশেম মহামূর্খ। ক্লাস ওয়ান থাইকা টুতে উঠতে পারতেছে না, তিনবার ফেইল করছে। আমার বাবার কাজই ছিল ঋণ করা। ওস্তাদ, আরও দুই-একটা জ্ঞানের কথা বলেন,শুনি।

সাপ যখন মানুষের সামনে ফণা তোলে, তখন স্থির হয়ে থাকে না। ডানে-বামে সারাক্ষণ মাথা দোলায়। কেন, জানো? সাপের চোখ ফণার দুই দিকে। স্থির হয়ে থাকলে সে সামনের কিছু দেখতে পারে না বলেই সারাক্ষণ ফণা দোলায়। তার সামনে কী আছে, তা দেখার জন্যেই সাপকে ফণা দোলাতে হয়। বিরাট একটা জিনিস শিখলাম। ওস্তাদ, পা-টা আগায়ে দেন। পা ছুঁইয়া সালাম করি।

ভাইয়াকে তার অদ্ভুত বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভাইয়া বলল, ওদের মাথায় শুধু একটা বিষয়ই আছে–তার নাম ‘অপরাধ’। ওরা সিঙ্গেল ট্র্যাক হয়ে গেছে। অপরাধ ছাড়া আর কিছুই এরা ভাবতে পারে না। তাদের মাথার পুরোটাই খালি। সেই শূন্য মাথায় বুদ্ধিমান মানুষ অনায়াসে ঢুকে ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমি তা-ই করছি।

তুমি কি ক্রিমিনাল?

আমরা সবাই ক্রিমিনাল। মানুষ হয়ে জন্মানোর প্রধান শর্তই হচ্ছে, তাকে ক্রিমিনাল হতে হবে।

তাহলে মহাত্মা গান্ধীও ক্রিমিনাল?

ভাইয়া হাসতে হাসতে বলল, তুই আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসবি না। তর্কে পারবি না।

রহিমার মা

রহিমার মা কয়েক দিন ধরে ঠোঁটে লাল লিপস্টিক দিচ্ছে। অনেক সময় নিয়ে ভাইয়ার ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, ঘর মুছছে। ভাইয়া একদিন তাকে বলল, রহিমার মা, ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়ার জন্যে তোমার চেহারায় বেশ্যা ভাব চলে এসেছে। তোমাকে দেখাচ্ছে বেশ্যাদের মতো।

হতভম্ব রহিমার মা বলল, ভাইজান, এইটা কী কন?

যেটা সত্যি, সেটা বললাম। তুমি ঠোঁটে শুধু যে লিপস্টিক দিয়েছ তা না, গায়ে একগাদা সস্তা সেন্ট মেখেছ। সস্তা সেন্ট থেকে পচা বিষ্ঠার গন্ধ আসে। তোমার গা থেকে পচা বিষ্ঠার গন্ধ আসছে।

বিষ্ঠা কী?

বিষ্ঠা হচ্ছে গু। তুমি আমার ঘর থেকে বের হও। গুয়ের গন্ধে তুমি আমার ঘর গন্ধ করে ফেলছ।

ভাইয়ার কথা শুনে রহিমার মা সেদিন আর কোনো কাজকর্ম করল না। কলের পাশে বসে সারা বিকেল কাঁদল। পদ্মকে দেখলাম ঘটনা আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছে।

পদ্ম

পদ্ম যে পদ্মর মতোই সুন্দর তা যতই দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কেন জোর করে তাকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, এখন তা স্পষ্ট। অতিরূপবতীদের আশপাশে থাকা অস্বস্তির। আমি অস্বস্তির মধ্যে আছি। তার সঙ্গে দুবার আমার কথা হয়েছে। প্রথমবার সে আমাকে কঠিন গলায় বলল, আপনি আমাকে নিয়ে যখন এ-বাড়িতে আসেন, তখন আমি জ্বরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, না?

হুঁ।

সেই সুযোগে আপনি কি আমার গায়ে হাত দিয়েছেন?

হুঁ।

আশ্চর্য! প্রথম সুযোগেই গায়ে হাত দিলেন?

তুমি সিট থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলে। তোমাকে টেনে সিটে তুলতে হয়েছে। গায়ে হাত না দিয়ে সেটা করা সম্ভব ছিল না।

গায়ে হাত দেওয়ার একটা অজুহাতও বের করে ফেলেছেন? আমি লক্ষ করেছি প্রায়ই আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকেন। আরেকবার এ রকম দেখলে উলের কাঁটা দিয়ে চোখ গেলে দেব।

স্ত্রীর দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকা তো দোষের কিছু না।

স্ত্রী মানে? আরেকবার এই ধরনের রসিকতা করলে গলা টিপে মেরে ফেলব।

দ্বিতীয় দফায় তার সঙ্গে যে কথা হয় তা হলো–

আপনাদের ওই কাজের মেয়ে, রহিমার মা, তাকে দেখলাম আপনার ভাইয়ার ঘর থেকে বের হয়ে সারা বিকেল কলের পাড়ে বসে কেঁদেছে। ঘটনা কী?

রহিমার মা ভাইয়ার প্রেমে পড়েছে, এই হলো ঘটনা।

কাজের ঝির সঙ্গে আপনার ভাইয়ের প্রেম?

হুঁ। একপক্ষীয় প্রেম। ভাইয়া এখনো কোনো সাড়াশব্দ করছে না। তবে করতেও পারে। ভাইয়াকে বোঝা মুশকিল।

আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন এটা ঘটনাই না।

বড়লোকের মেয়ে যদি প্রেমে পড়তে পারে, তাহলে কাজের বুয়াও প্রেমে পড়তে পারে।

আমার গা ঘিনঘিন করছে।

তাহলে যাও, গোসল করে ফেলো। সাবান ডলা দিয়ে হেভি গোসল করলে গা ঘিনঘিন দূর হবে।

পদ্ম মেয়েটির বিষয়ে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। মেয়েটির স্লিপ ওয়াকিং সমস্যা আছে। এক রাতের কথা। একটা বা দুটা বাজে। ঘুম আসছে না বলে বাইরে বসে আছি। হঠাৎ দেখি দরজা খুলে পদ্ম বের হলো। তার চোখমুখ শক্ত, সে উঠানে দুটা চক্কর দিল।

আমি ডাকলাম, এই পদ্ম, এই। সে ফিরে তাকাল না। আবার নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

ভাইয়ার ছোট মা

এই মহিলার বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে–ওনার গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি। আমি এত মিষ্টি কণ্ঠস্বর আগে শুনিনি।

এমন মিষ্টি কণ্ঠস্বরের মহিলা, কিন্তু আচার-আচরণ কঠিন। তাঁর একমাত্র কাজ মেয়েকে চোখে-চোখে রাখা। পদ্ম যেখানে যাচ্ছে, উনি তার পেছনে পেছনে যাচ্ছেন।

কানায় কানায় পূর্ণ কলসির মতো তার অন্তর হিংসায় পূর্ণ। মহিলা ভাইয়ার রগট ধর্মে যোগ দিতে পারেন।

তাঁর সঙ্গে আমার এক দিনই কথা হয়েছে। তিনি আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে বলেছেন, তোমার বড় ভাইকে ডেকে বলবে, সে যেন আমাকে ছোট মা না ডাকে। মা-মা খেলার অর্থ আমি জানি।

আমি বললাম, কী অর্থ, বলুন?

আমাকে ভজানো। আমাকে ভজিয়ে আমার মেয়ের কাছে যাওয়া।

আমি সরল মুখ করে বললাম, অন্যের বউয়ের কাছে ভাইয়া যাবে না। এই সব ঝামেলা ভাইয়ার মধ্যে নেই।

অন্যের বউ মানে? তুমি কী বলছ?

পদ্মর বিয়ে হয়েছে আমার সঙ্গে। চার লাখ টাকা দেনমোহর। অর্ধেক উসুল।

তোমার ভাইয়ার মধ্যে যে ফাজলামি স্বভাব আছে, তা তোমার মধ্যে আছে। ভুলেও আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না। মুখ হাঁ করিয়ে মুখে এসিড ঢেলে দেব।

এসিড কোথায় পাবেন?

এসিড আছে আমার সঙ্গে। দেখতে চাও। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

ভদ্রমহিলা ছুটে ঘরে ঢুকলেন, নীল রঙের একটা বোতল নিয়ে বের হলেন। বোতলের মুখ খুলে তরল কিছু একটা ঢালতেই বিজবিজ শব্দে উঠান পুড়তে লাগল। উঠান থেকে ধোঁয়া

উঠল।

আমি কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত। ‘ছোট মা’ না ডেকে তাঁকে ‘এসিড-মা’ ডাকা দরকার।

এসিড মাতা বললেন, পদ্ম স্যান্ডেল কিনবে। তুমি তার সঙ্গে যাও। আমার শরীর খারাপ, আমি যেতে পারছি না। আমার মেয়েকে আমি একা ছাড়ি না। নিয়ে যেতে পারবে?

পারব।

এক রিকশায় যাবে না। আলাদা রিকশায় যাবে।

আমি বললাম, আলাদা রিকশায় গেলে চোখের আড়াল হবার সম্ভাবনা থাকে, এক রিকশাতেই যাই। আমি পাদানিতে বসলাম, পদ্ম সিটে বসল।

পদ্ম আমার কথায় শব্দ করে হেসে ফেলেছে। তার মায়ের কঠিন দৃষ্টির সামনে তার হাসি দপ করে নিভে গেল।

ড্রাইভার ইসমাইল

তার সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে পারছি না। এই কদিন সে কাকরাইল মসজিদে চিল্লায় গিয়েছিল। সাত দিন পার করে জ্বর নিয়ে ফিরেছে। রহিমার মা তার মাথায় পানি ঢালছে, স্যুপ বানিয়ে খাওয়াচ্ছে। রহিমার মায়ের কাছেই শুনলাম, ড্রাইভার চিল্লা থেকে একটা জিন নিয়ে ফিরেছে। জিনের কারণেই তার প্রবল জ্বর। জিনের নাম মফি। বয়স তিন হাজার বছর।

চরিত্র-পরিচিতিমূলক লেখা শেষ হয়েছে। সবার গতি ও অবস্থান যতটুকু সম্ভব বলা হলো। এখন মূল গল্পে যাওয়া যেতে পারে। পদ্মকে নিয়ে রওনা হয়েছি। পদ্ম বলল, আমার স্যান্ডেল কেনার কোনো দরকার নেই, আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলা দরকার।

আমি বললাম, বলো।

পদ্ম বলল, একগাদা মানুষের মধ্যে জরুরি কথা কীভাবে বলব! আপনার কাছে যদি টাকা থাকে, কোনো একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে যাই, চলুন। আমার কাছে কুড়ি টাকার একটা নোট আছে। এই টাকা নিয়ে চায়নিজ রেস্টুরেন্টে যাওয়া যায় না।

আপনার ভাইয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসুন। আমার টম ইয়াম স্যুপ খেতে ইচ্ছে

করছে।

ভাইয়ার কাছে টাকা থাকে না। রহিমার মায়ের কাছে ধার চেয়ে দেখতে পারি। মাঝে মাঝে সে আমাকে টাকা ধার দেয়।

রহিমার মায়ের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হবে না। চলুন, পার্কে যাই। আপনার ভাই যেমন আশ্চর্য মানুষ, আপনিও আশ্চর্য মানুষ।

আমরা রমনা পার্কে ঢুকে গেছি। সেখানে বাজারের চেয়েও ভিড় বেশি। মোটামুটি নিরিবিলি একটা জায়গা পাওয়া গেল। কেয়াগাছের ঝাড়। সামনে ডাস্টবিন। ডাস্টবিন থেকে বিকট গন্ধ আসছে। এই কারণেই বোধহয় লোকজন এদিকে আসে না।

পদ্ম, কী বলবে বলো।

পদ্ম বলল, আপনার সম্বন্ধে আমার মায়ের কী ধারণা, জানতে চান?

আমি যে জানতে চাই, তা না, তুমি বলতে চাইলে বলো।

পদ্ম বলল, আমার মায়ের ধারণা, আপনি চালবাজ বেকুব।

এটাই কি তোমার জরুরি কথা?

পদ্ম বলল, না। জরুরি কথাটা হচ্ছে, ট্রাক ড্রাইভার সালামতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। তার সঙ্গে ছয় দিন একসঙ্গে ছিলাম। আমি তার কাছে ফিরে যেতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

কথা শেষ করে পদ্ম ফিক করে হাসল। তাকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল মনে হলো।

আমি বললাম, পদ্ম! কোনো ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি। এই গল্পটা তুমি বানিয়ে বলছ। তোমার মায়ের ধারণা হয়েছে, এ রকম একটা গল্প শুনলে আমি আর তোমার ধারেকাছে ঘেঁষব না। তুমি আমার কাছ থেকে নিরাপদ থাকবে। গল্পটা তোমার মা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

পদ্ম হাসিমুখে বলল, তাই বুঝি?

আমি বললাম, উনি তোমাকে একা ছাড়ার মহিলা না, আমাকে তোমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন, যাতে তুমি গল্পটা বলতে পারো।

পদ্ম বলল, কোন জায়গায় আপনি নিয়ে এসেছেন? বিশ্রী গন্ধ! চলুন, ভালো কোনো

জায়গায় বসি। আইসক্রিম খাব। আইসক্রিমের টাকা আমি দেব। আমার কাছে টাকা আছে। সালামত সাহেব আমাকে প্রতি মাসে পনেরো শ টাকা হাতখরচ দেন। এ মাসেরটা অবশ্যি পাইনি।

পদ্মকে নিয়ে বাসায় ফিরছি। দুজন একই রিকশায়। পদ্মর হাতে কোন আইসক্রিম। সে আগ্রহ নিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে। পদ্ম বলল, আমি এই পর্যন্ত রিকশার সিট থেকে কতবার পড়েছি জানেন?

আমি বললাম, জানি না।

জানতে চান?

না। জেনে আমার লাভ কী?

লাভ আছে। আমাকে নিয়ে যখন রিকশায় উঠবেন তখন সাবধান থাকবেন। আমাকে ধরে রাখবেন। অন্যের রূপবতী স্ত্রীর হাত ধরে থাকার মধ্যে আনন্দ আছে।

তুমি রিকশার হুড শক্ত করে ধরে বসে থাকো। তাহলেই হয়।

পদ্ম বলল, ছোটবেলায় একবার রিকশায় হুড ধরে বসেছিলাম। হঠাৎ ধুম করে হুড পড়ে গেল। আঙুলে প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম। একটা আঙুল ভেঙে গিয়েছিল। এর পর থেকে আমি রিকশার হুড ধরতে পারি না। রিকশায় উঠলেই ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়।

তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না তোমার ভয়ে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পদ্ম বলল, আপনি সঙ্গে আছেন, তাই ভয় পাচ্ছি না। যখন আমি পড়ে যাব তখন নিশ্চয় আপনি আমাকে ধরবেন। ধরবেন না?

পদ্ম কথা শেষ করার পরপরই রিকশা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। প্রথমে পড়ল পাটাতনে, সেখান থেকে রাস্তায়। তার বাঁ পায়ের ওপর দিয়ে রিকশার চাকা চলে গেল। আমি রাস্তা থেকে তাকে টেনে তুললাম। পদ্ম বলল, দেখুন, আইসক্রিম ঠিক আছে। আমি ভেবেছিলাম আইসক্রিম হাত থেকে ছিটকে পড়বে।

ব্যথা পেয়েছ?

পেয়েছি। পায়ের ওপর দিয়ে রিকশা চলে গেল, রিকশায় আপনি বসা, ব্যথা পাব নাতবে ! ব্যথার চেয়ে মজা বেশি পেয়েছি।

মজা পাওয়ার কী আছে?

মজা পাওয়ার কী আছে সেটা আরেক দিন আপনাকে বলব।

পদ্ম ব্যথা ভালোই পেয়েছে। সে ঘরে ঢুকল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পদ্মর মা আতঙ্কিত গলায় বলছেন, তোর কী হয়েছে?

পদ্ম বলল, ট্রাকড্রাইভারের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, এটা ওনাকে বললাম। উনি রেগে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে আমাকে রিকশা থেকে ফেলে দিলেন। মা, তুমি বলেছ না আলাদা আলাদা রিকশা নিতে? আমি একটা রিকশা নিলাম, উনি লাফ দিয়ে সেই রিকশায় উঠলেন। রাস্তায় তো আমি এই নিয়ে হইচই করতে পারি না।

পদ্মর মা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি তাকিয়ে আছি পদ্মর দিকে। পদ্মর চেহারা স্বাভাবিক। এতই স্বাভাবিক যে একপর্যায়ে আমার মনে হলো, আমি হয়তো সত্যিই পদ্মকে ধাক্কা দিয়ে রিকশা থেকে ফেলেছি।

তুমি আমার মেয়েকে রিকশা থেকে ফেলে দিয়েছ?

আমি বললাম, হুঁ।

তোমার এত বড় সাহস?

আমি বললাম, আমাদের দুজনের মধ্যে আরগুমেন্ট হচ্ছিল। পদ্ম বলছে, পৃথিবীতে ডিম আগে এসেছে। ডিম থেকে মুরগি। আমি বলছি, প্রথম এসেছে মুরগি, তারপর ডিম। তর্কের এক পর্যায়ে হাতাহাতি শুরু হলো। তারপর দুর্ঘটনা।

এসিড মাতা মেয়ের দিকে তাকালেন। পদ্ম-মুখ গম্ভীর করে বলল, তর্কে উনি হেরে গিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছেন। এই বিষয়ে তোমাকে কিছু করতে হবে না, মা। আমি শোধ নেব। আমার স্যান্ডেল এখনো কেনা হয়নি। একদিন স্যান্ডেল কিনতে ওনাকে নিয়ে যাব। তারপর ধাক্কা দিয়ে রিকশা থেকে ফেলে দেব।

এসিডমাতা মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকে- গেলেন। তাদের ঘরের দরজা খোলা, সেখানে বারো-তেরো বছরের নির্বোধ চেহারার এক বালিকাকে ঝাঁটা হাতে দেখা যাচ্ছে।

বালিকার নাম মরি। মরিয়ম থেকে মরি। কাজের মেয়েদের দীর্ঘ নামে ডাকা সময়ের অপচয় বলেই মরিয়ম হয়েছে মরি।

মরি পদ্মদের বাড়িতে আগে কাজ করত, এখন আবার যুক্ত হয়েছে। পদ্মর মা তাঁর সংসার গুছিয়ে নিতে শুরু করেছেন। ভ্যানে করে একদিন একটা নতুন ফ্রিজ চলে এল। মিস্ত্রি এসে ফ্রিজ পদ্মদের শোবার ঘরে সেট করে দিল। পদ্ম আমাকে এসে বলল, আপনার ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছা হলে আমাকে বলবেন। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি খেতে দেব।

আচ্ছা বলব।

আমি যে খুব ভালো রাঁধতে পারি তা জানেন?

না।

আমাদের নিজেদের রান্নাঘর হোক, আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।

তোমাদের আলাদা রান্নাঘর হচ্ছে নাকি?

মা বলছে, হবে। যেদিন রান্নাঘর প্রথম চালু হবে, সেদিনই আপনাকে স্পেশাল একটা আইটেম খাওয়াব। আইটেমটার আমি নাম দিয়েছি 'সালামত ডিলাইট'। ও এই আইটেম খুব পছন্দ করে বলে ওর নামে নাম। আপনিও যদি পছন্দ করেন তাহলে নাম বদলে দেব 'মনজু সালামত ডাবল ডিলাইট'। নাম সুন্দর না?

হুঁ।

আমার লাগবে বাংলাদেশের মাশরুম। এই মাশরুম চাক চাক করে কেটে গোলমরিচলবণ - দিয়ে বেসনে চুবিয়ে ডুবোতেলে ভাজা হবে।

পদ্ম মিটমিট করে তাকাচ্ছে। তার চোখের ভাষা পড়তে পারছি না। খানিকটা অস্বস্তি লাগছে। পদ্মর চোখের ভাষা পড়াটা জরুরি কেন বুঝতে পারছি না।

বাবা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। পারিবারিক জরুরি মিটিং না বলে মনে হচ্ছে। পারিবারিক মিটিংয়ে ভাইয়া উপস্থিত থাকত। তাকে ডাকা হয়নি। এমনও হতে পারে যে বাবা তাকে পরিবার থেকে বের করে দিয়েছেন।

বাবা বললেন, পদ্মর মা একটা নতুন ফ্রিজ কিনেছেন বলে শুনলাম।

আমি বললাম, হুঁ। আট সিএফটির ফ্রিজ। লাল রং। স্যামসাং কোম্পানি।

এত বিস্তারিত শুনতে চাচ্ছি না। অল্প কথায় মনের ভাব প্রকাশে অভ্যাস করো। হড়বড়

করে দুনিয়ার কথা বলার কিছু নেই।

জি, আচ্ছা।

ওই মহিলা কি স্থায়ীভাবে থাকার পরিকল্পনা করছে?

জি। তাদের আলাদা কাজের মেয়ে চলে এসেছে। নাম মরি। মরিয়ম থেকে মরি। শুনেছি তাদের আলাদা রান্নাঘরও হবে।

তোমার কি মনে হয় না যে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন?

কী ব্যবস্থা?

ব্যবস্থা একটাই—ঘাড় ধরে মা-মেয়েকে বের করে দেওয়া। তবে আমরা সিভিল সোসাইটিতে বাস করি। ইচ্ছা থাকলেও অনেক কিছু করা সম্ভব না।

আমি বললাম, সম্ভব হলেও করা ঠিক হবে না। পদ্মর মায়ের কাছে নীল রঙের বোতলে ভর্তি এসিড আছে। এসিড ছুড়ে একটা কাণ্ড করে বসতে পারেন।

এসিডভর্তি বোতল?

জি, বাবা।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তোমার ভাইয়াকে বলো একটা ব্যবস্থা করতে। যে কাঁটা বিঁধিয়েছে, তারই দায়িত্ব কাঁটা বের করা। তোমার ভাইকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলাম। সে যাচ্ছে না কেন?

অমাবস্যার জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রথম অমাবস্যাতেই ঘর ছাড়বে। গৌতম বুদ্ধ পূর্ণিমাতে গৃহত্যাগ করেছিলেন, ভাইয়া করবে অমাবস্যায়। উনি নতুন এক ধর্ম প্রচার করবেন। ধর্মের নাম রগট ধর্ম। তিনটি মূলনীতির ওপর এই ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। নীতিগুলো বলব, বাবা?

বাবা অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবার চোখের ভাষাও আমি পড়তে পারছি না।

ট্রাকড্রাইভার এবং ট্রাকচালক সমিতির পিআরও সালামত এসেছে ভাইয়ার কাছে। সালামত লম্বা, চেহারায় ইঁদুরভাব প্রবল। চোখ কোটর থেকে খানিকটা বের হয়ে আছে।

লম্বা নাক, নাকের নিচে পুরুষ্ট গোঁফ। গায়ের রং কোনো একসময় হয়তো ফরসা ছিল। ময়লা জমে কিংবা রোদে পুড়ে কালচে ভাব ধরেছে। তাকে ঘিরে সস্তা সিগারেটের গন্ধের সঙ্গে মিলেছে জর্দার কড়া গন্ধ। তবে এখন সে পান খাচ্ছে না।

আমি বসেছি ভাইয়ার ঘরের বারান্দায়। ভাইয়াকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সালামতকে দেখতে পাচ্ছি না। ভাইয়া বলল, আপনি ট্রাক চালান? আপনি তো ভাগ্যবান মানুষ।

এটা কেন বললেন?

বাংলাদেশের সব ট্রাকচালকের বেহেশত নসিব হবে, এই জন্যে বললাম।

কী বলেন এই সব?

ছুটন্ত ট্রাক দেখলেই আশপাশের সবাই আল্লাহর নাম নেয়। আপনাদের কারণে এত লোকজন আল্লাহর নাম নিচ্ছে, এই জন্যে আপনারা সরাসরি বেহেশতে যাবেন।

এই সব বাদ দেন। আমি আপনার কাছে কী জন্যে এসেছি সেটা শোনেন। উপায় না দেখে এসেছি।

বলুন, কী ব্যাপার।

পদ্ম মেয়েটার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেন। এটা আমার রিকোয়েস্ট। তার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে। একজনের বিবাহিত স্ত্রীকে আপনারা উঠায়ে নিয়ে এসেছেন, এটা কেমন কথা? আপনার স্ত্রীকে কেউ উঠায়ে নিয়ে গেলে আপনি কী করতেন?

ভাইয়া বলল, আমার স্ত্রীকে কেউ উঠায়ে নিয়ে যায় নাই, কাজেই কী করতাম বলতে পারছি না।

ভাইসাহেব, আমি ট্রাক নিয়ে এসেছি। পদ্মকে ডেকে দিন। আমি তাকে নিয়ে চলে যাব। কী ঘটেছিল তা নিয়ে মাথা ঘামাব না।

পদ্ম কি যাবে আপনার সঙ্গে?

অবশ্যই যাবে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন। এটা আপনার কাছে রিকোয়েস্ট। রিকোয়েস্ট না শুনলে অন্য পথ ধরব। সেটা আপনার ভালো লাগবে না।

ভাইয়া পদ্মকে ডেকে পাঠালেন। পদ্ম এসে দাঁড়াল। আমি বারান্দা থেকে পদ্মকে দেখতে পাচ্ছি না। দেয়ালে পদ্মর ছায়া পড়েছে। সেই ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

ভাইয়া বলল, পদ্ম! ট্রাকড্রাইভার সালামত তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। ট্রাক নিয়ে এসেছে। তুমি কি তার সঙ্গে যাবে?

পদ্ম মিষ্টি করে বলল, যাব। কেন যাব না!

সালামত বলল, আমার স্ত্রীর নিজের মুখের কথা শুনলেন। এই কথার পর আর বিবেচনা নাই। পদ্ম, যাও, তৈয়ার হয়ে আসো। দশ মিনিট সময়।

পদ্ম বলল, এখন তো যেতে পারব না। পায়ে ব্যথা পেয়েছি। হাঁটতে পারি না। পায়ের ওপর দিয়ে রিকশা চলে গিয়েছিল। তুমি দেখো, পা ফুলে কী হয়েছে! পায়ের ফোলা কমুক। দশ দিন পরে আসো। এর মধ্যে পা ভালো হয়ে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। সালামত বলল, পদ্ম, আমার কথা শোনো।

পদ্ম বলল, দশ দিন পরে তোমার কথা শুনব। এখন শুনব না।

পদ্ম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বের হয়ে গেল। ভাইয়া বলল, দশ দিন পর আসুন, দেখি কী হয়। সালামত হতাশ গলায় বলল, দশ দিন পরেও কিছু হবে না। এই মেয়েকে আর মেয়ের মাকে আমি হাড়ে-গোশতে চিনি। ভাইসাহেব, শুনেন। এই মেয়ের পড়াশোনার খরচ, হাতখরচ–সব আমি দিয়েছি। মা-মেয়ের মাসখোরাকি খরচ দিয়েছি। আমার টাকায় মেয়ে বিএ পাস দিয়েছে। যখন বিয়ের কথা বলাম তখন পদ্ম বলল, 'আপনার স্ত্রী আছে, আমি তো সতিনের ঘর করব না। স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আসেন। তারপর বিবেচনা করব।' জোবেদারে তালাক দিলাম। জোবেদা আমার স্ত্রী। সে দুই মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। পদ্ম শুরু করল নানান ক্যাঁচাল। আজ না, সাত দিন পরে বিয়ে। সাত দিন পরে বলে, 'বিষ্যুদবারে আমি বিয়ে করব না। বিষ্যুদবার আমার জন্যে খারাপ।' তখন অন্য ব্যবস্থা নিলাম। বিয়ে হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা তাকে নিয়ে ট্রাক চালায়ে দিনাজপুর যাব–সব ঠিকঠাক। ট্রাক নিয়ে উপস্থিত হয়ে শুনি, তাকে আপনারা জোর করে তুলে নিয়ে গেছেন। ভাইয়া বলল, এত দিন যখন অপেক্ষা করেছেন, আরও দশটা দিন যাক। সবুরে মেওয়া ফলে। আপনার বেলায় সবুরে বউ ফলবে।

সালামত বলল, আপনার কথা মানলাম। আসব দশ দিন পরে। তখন যদি কিছু না হয়, আমি অন্য লাইন ধরব। আমি এত সহজ পাত্র না। পদ্ম এটা জানে না, পদ্মর মা জানে।

সবকিছুর মূলে আছে ওই বদমাগি।
শাশুড়িকে মাগি ডাকছেন, এটা কেমন কথা!
ক্ষুব্ধ সালামত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।
সালামতের আগমন এবং প্রস্থানে পদ্মর মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সে কলপাড়ে বসে আছে। তার এক পা প্লাস্টিকের গামলায় ডোবানো। পায়ের জলচিকিৎসা চলছে। রহিমার মা গলা নামিয়ে তার সঙ্গে গল্প করছে।
গল্পের বিষয়বস্তু ড্রাইভার ইসমাইলের জিন। এই জিন ইসমাইলের সঙ্গেই সারাক্ষণ থাকে। শুধু শনিবার আর সোমবার থাকে না। এই দুই দিন জিন তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। জিনের স্ত্রীর নাম হামছা।

আজ ছুটির দিন। বাবা বাসায় আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি সাপ্তাহিক বাজারে যাবেন। আমাকে সঙ্গে যেতে হবে কি না বুঝতে পারছি না। বাবার সঙ্গে বাজারে যাওয়া বিড়ম্বনার ব্যাপার। কাঁচা মরিচ কেনার আগে তিনি মরিচ টিপে টিপে দেখবেন। একটা ভেঙে গন্ধ শুঁকবেন। ভাঙা মরিচ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলবেন, 'জিভে ছুঁইয়ে দেখ ঝাল কি না।' মরিচ বিক্রেতা এই পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে বলবে, 'মরিচ ভাঙেন ক্যান?' বাবা শান্ত গলায় বলবেন, 'তোমার কাছ থেকে যদি মরিচ নাও কিনি, এই ভাঙা মরিচের দাম দেব। কাজেই হইচই করবে না। যে ভোক্তা, তার আইনি অধিকার আছে দেখেশুনে পণ্য কেনার। প্রয়োজনে মামলা করে দেব। বুঝেছ?'
একবার মাছ কিনতে গিয়ে মাছওয়ালার সঙ্গে তাঁর মারামারির উপক্রম হলো। মাছওয়ালা বঁটি উঁচিয়ে বলল, 'দিমু কোপ।' বাবা শান্ত গলায় বললেন, 'কোপ দিতে হবে না। তুমি যে বঁটি উঁচিয়েছ, এর জন্যেই অ্যাটেম টু মার্ডারের মামলা হয়ে যাবে। সাত বছর জেলের লাপসি খেতে হবে। লাপসি চেন?'
বাবার কথা থাক। নিজের কথা বলি। আমি আগ্রহ নিয়ে পদ্ম ও রহিমার মায়ের কথা শুনছি। রহিমার মা উঠে যাওয়ার পর আমি পদ্মর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পদ্ম আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, ট্রাকড্রাইভারের সঙ্গে বিয়ে আমার হয়েছে, এই কথা আপনাকে

বলেছিলাম। এখন কি আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে?

হ্যাঁ।

এ কিন্তু মানুষ খারাপ না। আমাকে পড়াশোনা করিয়েছে। যেদিন বিএ পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে, সেদিন শাড়ি কিনে দিয়েছে।

প্রিয় স্বামীর সঙ্গে চলে গেলে না কেন?

পদ্ম বলল, ভাঙা পা নিয়ে যাব নাকি! পা ঠিক হোক, তারপর যাব। স্বামী ট্রাক চালাবে, আমি পাশে থাকব। বিড়ি ধরিয়ে তার ঠোঁটে দিয়ে দেব। ট্রাক চালাতে চালাতে যেন ঘুমিয়ে না পড়ে এই জন্যে সারাক্ষণ তার গায়ে চিমটি কাটব। দেখুন, আমি হাতের নখ বড় রেখেছি চিমটি কাটার সুবিধার জন্যে। আপনি হাতটা বাড়ান, আপনার হাতে একটা চিমটি কেটে দেই।

আমার হাতে চিমটি কাটবে কেন?

আপনি আমার নকল স্বামী, এই জন্যে আপনার হাতে নকল চিমটি কাটব।

পদ্ম চিমটি কাটার সুযোগ পেল না, বাবা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন।

আমি এখন বাবার শোবার ঘরে। মা চাদর গায়ে শুয়ে আছেন। হাঁপানির টান এখনো ওঠেনি। টান উঠবে কি না তা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোলাটে বলে মনে হচ্ছে। কারণ, পদ্মর মা উপস্থিত আছেন। তিনি চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর পাশের একটা চেয়ারে আমি বসেছি। ভদ্রমহিলা বিরক্ত চোখে আমাকে দেখছেন। বাবা বসেছেন মায়ের পাশে। বাবা প্রধান বিচারকের ভূমিকায় আছেন বলে মনে হচ্ছে। মা প্রধান বিচারকের সাহায্যকারী।

বাবা পদ্মর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাবি! আমাকে বলা হয়েছিল, আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন বলেই কিছুদিন আমার এখানে থাকতে এসেছেন। আমি বিষয়টা মেনে নিয়েছি। অনেক দিন পার হয়েছে। এখন আপনাদের চলে যেতে হবে। আপনাকে এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি।

পদ্মর মা চুপ করে আছেন। বাবার কথা শুনে তিনি যে ঘাবড়ে গেছেন এ রকম মনে হচ্ছে না। ভদ্রমহিলা শক্ত জিনিস। এসিড-মাতা বলে কথা!

বাবা বললেন, শেক্সপিয়ার বলেছেন, I have to be cruel only to be kind. এর অর্থ, মমতা প্রদর্শনের জন্যেই আমাকে নির্মম হতে হবে। আমি আমার ছেলেদের প্রতিও নির্মম। শুনেছেন নিশ্চয়ই, আমি আমার বড় ছেলেকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছি। শুনেননি?

শুনেছি।

আপনাকেও একটা সময় বেঁধে দিচ্ছি। এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবার।

পদ্মর মা অবাক হয়ে বললেন, যে জমির ওপর এই বাড়ি, সেই জমি তো আমার। আমি কেন বাড়ি ছাড়ব?

বাবা বললেন, তার মানে?

জমির কাগজপত্র আমার নামে।

বাবা বললেন, ভাবি, শুনুন। নানা দুশ্চিন্তায় আপনার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। জমি আপনার নামে, মানে কী?

আমার কাছে কাগজপত্র আছে। আপনার বড় ছেলে জোগাড় করে দিয়েছে।

বাবা বললেন, আচ্ছা, আপনি যান, পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব। মনজু, তুই তোর ভাইকে ডেকে আন।

আমি বললাম, ভাইয়া তো এখন ঘুমাচ্ছে।

ঘুম থেকে ডেকে তুলে আন।

পদ্মর মা বলল, আপনি কি কাগজগুলো দেখবেন?

পরে দেখব। এখন আপনি যান।

দ্বিতীয় সিটিং বসেছে। ভাইয়াকে ঘুম ভাঙিয়ে আনা হয়েছে। ঘুম পুরোপুরি কাটেনি। ভাইয়া একটু পরপর হাই তুলছে। পদ্মর মা যে চেয়ারে বসেছিলেন, ভাইয়া সেখানে বসেছে। বাবা

অনেকক্ষণ ভাইয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। এটা বাবার পুরোনো টেকনিক। মূল বাজনায় যাওয়ার আগে তবলার ঠুকঠাক।

বাবা বললেন, শুনলাম তুমি পদ্মের মাকে কী সব কাগজপত্র দিয়েছ?

ভাইয়া বলল, ঠিকই শুনেছ। জমির দলিল আর নামজারির কাগজ।

পেয়েছ কোথায়?

সাবরেজিস্ট্রি অফিসে দুষ্ট কিছু লোকজন থাকে, যারা মিথ্যা কাগজ তৈরি করে দেয়।

তুমি ভুয়া কাগজপত্রের ব্যবস্থা করেছ?

হ্যাঁ। তবে ভুয়া হলেও কঠিন ঝামেলার কাগজ। মামলা করলে ফয়সালা হতে বিশ-পঁচিশ তারপর দেখা যাবে বছর লাগবে।, মিথ্যা কাগজ টিকে গেল।

তুমি এই কাজটা কেন করেছ জানতে পারি?

ভাইয়া বলল, টেনশন তৈরি করার জন্যে করেছি, বাবা। ছোট মা এবং তুমি–এই দুজন এখন শত্রুপক্ষ। এক ছাদের নিচে দুই কঠিন শত্রুর বাস মানে নানান কর্মকাণ্ড। এত দিন তুমি ভেজিটেবল হয়ে বাস করছিলা, এখন থেকে তোমার ভেতর থেকে ভেজিটেবল ভাব চলে যাবে। ভেজিটেবল হয়ে তো আর শত্রুর মোকাবেলা করা যায় না। তোমাকে বাধ্য হয়ে জেগে উঠতে হবে। এতে তোমার লাভ হবে একপর্যায়ে দেখা যাবে, তোমার ছাত্র ছাত্রীরা তোমাকে মুরগি ডাকছে না। অনেক কথা বলে ফেললাম। নো অফেন্স, বাবা, যাই।

ভাইয়া উঠে দাঁড়াল। বাবা অধিক শোকে পাথর হয়ে বসে আছেন। একবার মায়ের দিকে তাকাচ্ছেন, একবার আমার দিকে। মায়ের হাঁপানির টান উঠে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে তিনি এখন বিচিত্র শব্দও করছেন। শব্দ অনেকটা প্রেশার কুকারের মতো। কিছুক্ষণ বিজবিজ, তারপর ফোঁস–গ্যাস বের হয়ে যাওয়া।

বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা পিস্তল থাকলে আমি নিজের হাতে তোমার ছেলেকে শ্যুট করতাম।

প্রবল ঝড়ের পর পরিস্থিতি অস্বাভাবিক শান্ত হয়। এখন আমাদের বাসার পরিস্থিতি শান্ত। পদ্মর মাথায় তার মা বাটা মেন্দি ঘসে ঘসে দিচ্ছেন। বাবা বাজার নিয়ে ফিরেছেন। কাঁচাবাজার হাতে নির্বোধ চেহারার এক ছেলেকে দেখা যাচ্ছে। বাবার কাছ থেকে জানা

গেল, সে নিউমার্কেটে মিনতির কাজ করত। এখন থেকে এই বাড়িতে কাজ করবে। বাবার হাত-পা টিপে দেবে, ঘর ঝাঁট দেবে। ছেলের নাম জামাল। সে বাবাকে ‘আব্বা’ ডাকছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে, বাবা তার মুখে ‘আব্বা’ শুনে সন্তুষ্ট। বাবা নিজে জামালের জন্যে তোশক-বালিশ আর মশারি কিনে আনলেন। তাকে কৃমির ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হলো। সন্ধ্যাবেলা সে লাইফবয় সাবান দিয়ে গোসল করে আমাদের পরিবারভুক্ত হলো। বাবা তার সঙ্গে মিটিংয়ে বসলেন। কঠিন মুখ করে বললেন, আমি তোর দায়িত্ব নিয়েছি। শুধু ঘরের কাজ করলে হবে না। তোকে লেখাপড়া শিখতে হবে। রোজ আধঘণ্টা করে তোকে আমি পড়াব। ঠিক আছে?

জামাল বলল, জি, আব্বা।

বাবা বললেন, আজ থেকে শুরু। এই দেখ, একে বলে স্বরে অ। বল, স্বরে অ।

স্বরে অ।

এর পাশে আকার দিলে হয় আ, বল, আ।

আ।

দুইটা অক্ষর এক দিনে শিখে ফেললি। রাতে ঘুমাতে যাবার সময় একশবার করে স্বরে অ, স্বরে আ বলবি। ঠিক আছে?

ঠিক আছে, আব্বা।

এক একটা অক্ষর শিখবি আর দুই টাকা করে বকশিশ পাবি। আজ দুইটা অক্ষর শিখেছিস, এই নে চার টাকা।

জামাল টাকা নিয়ে বাবাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। পরদিন সকালে জামালকে পাওয়া গেল না। সে বাবার মোবাইল ফোন আর মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়েছে। মানিব্যাগে ছিল সাতাশ শ টাকা। উঠানে পদ্মর একটা শাড়ি শুকাতে দেওয়া ছিল। সেই শাড়িও পাওয়া গেল না। ভাইয়ার কর্মকাণ্ডে বাবা যতটা না মর্মাহত হয়েছিলেন, জামালের কর্মকাণ্ডে তার চেয়ে বেশি মর্মাহত হলেন। ইউনিভার্সিটি বাদ দিয়ে ঘরে বসে রইলেন। হাতে Party Jokes-এর বই।

পদ্মদের নিজস্ব রান্নাঘর চালু হয়েছে। বারান্দায় বাঁশের বেড়া দিয়ে ওপেন এয়ার কিচেন

টাইপ রান্নাঘর। সে রাঁধছে, বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি দুইটা কেরোসিনের চুলায় প্রথম রান্না বসল। রহিমার মা ভাইয়াকে জানাল, প্রথম দিন সরপুঁটি ভাজি আর কুমড়াফুলের ভাজি হচ্ছে।

ভাইয়া বলল, দুটাই তো শুকনা আইটেম।

রহিমার মা বলল, তরকারি আর ডাল আমাদের কাছ থেকে যাবে।

আমরা ওদের কোনো আইটেম পাব না?

মনে লয় না। একটা মাছ ভাজছে আর চাইরটা ফুল।

ভাইয়া বলল, কুমড়াফুলের ভাজি খেতে ইচ্ছা করছিল।

রহিমার মা বলল, কাইল আপনারে খিলাব। বকফুল ভাজি পছন্দ হয়? বকফুল আনব। সূত্রাপুর বাজারে পাওয়া যায়।

পদ্মদের পাশের গেস্টরুম তালাবদ্ধ ছিল। এক সকালবেলা (বুধবার আটটা চল্লিশ) পদ্মর মা তালা ভেঙে সেই ঘরের দখল নিয়ে নিলেন। বাবা হতভম্ব। আমাকে ডেকে বললেন, ঘটনা কী? পদ্মর মা আমার ঘরের তালা ভেঙেছে কী জন্যে?

আমি বললাম, ওনার কাছে চাবি ছিল না বলেই তালা ভেঙেছেন। চাবি থাকলে তালা ভাঙতেন বলে আমার মনে হয় না।

তুমি ব্যাপারটা বুঝতেই পারছ না। এরা চাচ্ছেটা কী? আমার বাড়িঘর দখল করে নিচ্ছে কেন? একটা ঘর কি তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিল না?

আমি বললাম, না। একটা ঘরে থাকবে পদ্ম আর ওদের কাজের মেয়ে মরি। অন্য ঘরে পদ্মর মা। সবারই প্রাইভেসির দরকার।

তুমি ওদের হয়ে কথা বলছ কেন? তোমার সমস্যা কী? তোমার আচার-আচরণ, কথাবার্তা এবং চিন্তাভাবনা প্রতিবন্ধীদের মতো, এটা জানো?' না।

সামনে থেকে যাও। পদ্মর মাকে আমার কাছে পাঠাও।

উনি বাড়িতে নেই, বাবা। ড্রাইভার ইসমাইলকে নিয়ে বের হয়েছেন।

কোথায় গেছেন?

কোথায় গেছেন শুনলে তুমি আপসেট হয়ে যাবে। তোমাকে আপসেট করতে চাচ্ছি না। উনি

তোমার গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন।
গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন, মানে কী? গাড়ি তো নষ্ট।
অন্য একটা গাড়ি দড়ি দিয়ে বেঁধে তোমার গাড়ি টেনে নিয়ে গেছেন।
তুমি কিছু বললে না?
না।

আমার ধারণা, উনি গাড়ি সারাতে নিয়ে গেছেন। ইসমাইল ড্রাইভার তা-ই বলল।

আমার সামনে হাবার মতো দাঁড়িয়ে থাকবে না। Get lost.
বাবার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মায়ের কাছে ধরা খেলাম। মা গাড়ির বিষয়ে এখনো কিছু জানেন না, তবে দ্বিতীয় গেস্টরুম দখল হয়ে গেছে এই খবর পেয়েছেন। তিনি হতাশ গলায় বললেন, এই সব কী হচ্ছে? ওরা নাকি গেস্টরুম দখল করে নিয়েছে?
হুঁ।
এখন আমরা কী করব? পুলিশে খবর দিব?
পুলিশে খবর দিয়ে লাভ হবে না। ওনার কাছে কাগজপত্র আছে, জমি তাঁর।
মা ফিসফিস করে বললেন, কাউকে দিয়ে কাগজপত্রগুলি চুরি করাতে পারবি?
আমি বললাম, এই বুদ্ধিটা খারাপ না। তুমি রহিমার মাকে লাগিয়ে দাও।
মা অনেক দিন পর উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসলেন। চাপা গলায় বললেন, টগরের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করলে কেমন হয়? এই সব বিষয় সে ভালো বুঝবে।
ভাইয়াকে ডেকে নিয়ে আসব?
না। আমি তার কাছে যাব।
মা তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে খাট থেকে পড়ে বিকট চিৎকার করতে লাগলেন, তখনো আমরা জানি না, মা তাঁর বাঁ পা ভেঙে ফেলেছেন। ‘রগট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা টগর সাহেব আষাঢ়ি অমাবস্যায় গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ঢাকার নিকটবর্তী গাজীপুর শালবনে তিনি কিছুদিন তপস্যায় থাকিবেন এমন আভাস পাওয়া গিয়াছে। ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়াছে, তাঁহার কিছু ভাবশিষ্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্যাঙা ভাইয়ের

নাম উল্লেখযোগ্য।'

টগর ভাইয়ার গৃহত্যাগ খবরের কাগজের বিষয় হলে এ রকম একটা খবর হতে পারত। তা হলো না। ভাইয়া ঝড় ও শিলাবৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাত নটায় বাড়ি ছাড়ল। বাবা তখন উঠানে বসে শিলাবৃষ্টি দেখছেন। মরি নামের মেয়েটা ছাতা মাথায় দিয়ে শিল কুড়াচ্ছে। তার উৎসাহ দেখার মতো। মানুষের স্বভাব হচ্ছে সে অন্যের অতি-উৎসাহী কর্মকাণ্ডে একসময় অজান্তেই নিজেকে যুক্ত করে ফেলে। বাবা তা-ই করেছেন। মরিকে কোথায় বড় শিল আছে বলে দিচ্ছেন, 'মরি, টিউবওয়েলের কাছে যাও। দুটা বড় বড় শিল আছে। আরে, এই মেয়ে তো চোখেই দেখে না। টিউবওয়েলের উত্তরে।'

এই অবস্থায় ভাইয়া হাসিমুখে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাবা! যাই।

বাবা বললেন, কোথায় যাও?

অমাবস্যায় বাড়ি ছেড়ে যাব বলেছিলাম। আজ অমাবস্যা!

বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছ?

হুঁ।

কোথায় যাবে?

গাজীপুরের শালবনের দিকে যাবার একটা সম্ভাবনা আছে। এখনো ঠিক করিনি।

তোমার মা জানে যে তুমি চলে যাচ্ছ?

জানে। তার কাছে বিদায় নিয়ে এসেছি।

তোমাকে আটকানোর চেষ্টা করেনি?

না। মা অস্থির তার পায়ের ব্যথায়। আহ-উহ করেই কুল পাচ্ছে না। আমাকে কি আটকাবে।

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার মা যখন তোমাকে কিছু বলেনি, আমিও বলব না। শুধু একটি কথা, তুমি বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক।

ভাইয়া মনে হয় বাবার কথায় আনন্দ পেল। তার ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসির আভাস দেখা গেল। বাবা বললেন, মিডিয়কার যদি নষ্ট হয়, তাতে তার নিজের ক্ষতি হয়। সমাজে

তার প্রভাব পড়ে না। মেধাবীরা নষ্ট হলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজ-সংসার ছেড়ে তোমার জঙ্গলে পড়ে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভাইয়া বলল, 'জি, আচ্ছা।' বলেই উঠানে নেমে মরির হাত থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাতা নিয়ে বের হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় মরি হকচকিয়ে গেছে। সে শিলভর্তি মগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় তার মাথায় বড় সাইজের একটা শিল পড়ল। 'ও আল্লা গো' বলে সে উঠানে চিত হয়ে পড়ে গেল। সুন্দর দৃশ্য। একটি বালিকা চিত হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর বৃষ্টি ও শিল পড়ছে। এমন দৃশ্য সচরাচর তৈরি হয় না। আমি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি, বাবার ধমক শুনে সংবিত ফিরল। বাবা বললেন, মেয়েটাকে তুলে আন।

আমি বললাম, থাকুক না।

বাবা বললেন, থাকুক না মানে? থাকুক না মানে কী?

আমি বললাম, থাকুক না মানে হলো, মরি চিত হয়ে উঠানে শুয়ে আছে, থাকুক। শিলাবৃষ্টির মধ্যে এ রকম শুয়ে থাকার সুযোগ সে আর পাবে বলে মনে হয় না।

আমার কথা শুনে বাবা বিকট চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলেন। বাবার চিৎকার শুনে মা তীক্ষ গলায় চেঁচাতে লাগলেন, 'কী হয়েছে? এই, কী হয়েছে?' ড্রাইভার ইসমাইল মনে হয় নামাজে ছিল। নামাজ ফেলে সে ছুটে এল। উঠানে মরিকে পড়ে থাকতে দেখে সে হতভম্ব গলায় বলল, স্যার! কী হয়েছে? মারা গেছে? ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন!

হইচই শুনেই মনে হয় মরির জ্ঞান ফিরল। সে এখন বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। তার হাতে কাচের পানির জগ। জগ ভর্তি শিল। মরির মাথা ফেটেছে। সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে জগে। ধবধবে সাদা বরফখণ্ডের ভেতর লাল রক্ত। অদ্ভুত দৃশ্য।

পদ্ম এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। সে হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেলল। এর মধ্যে হাসির কী উপাদান সে খুঁজে পেয়েছে কে জানে!

ভাইয়ার গৃহত্যাগের দ্বিতীয় দিবস। রগট ধর্মমতের সাল গণনায় ০২.০১.০১ রগট সন। এই দিনে বাবার গাড়ি ফিরে এল। ইঞ্জিন মোটামুটিভাবে সারানো হয়েছে। বছর খানেক ঝামেলা ছাড়াই চলবে। গাড়ি সারাইয়ের কাজটা করেছে ছগীর মিস্ত্রি। সে পদ্মর মায়ের

বিশেষ পরিচিত। বস্তিতে তার ঘর ছিল পদ্মর মায়ের ঘরের পাশে। গাড়ির সঙ্গে ছগীর মিস্ত্রি এসেছে। কালিঝুলিমাখা একজন হাসিখুশি মানুষ। তার কাছেই জানলাম, গাড়ি সারাইয়ে ত্রিশ হাজার টাকা বিল হয়েছে। পদ্মর মা বললেন, আমার গাড়ি ঠিক করেছ, তার জন্যে তোমাকে বিল দিব কী জন্যে? এক পয়সাও পাবে না।

ছগীর পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, না দিলে নাই।

পদ্মর মা বললেন, গোসল করো। খাওয়াদাওয়া করে তারপর যাবে।

ছগীর বলল, গোসল করব কীভাবে? কাপড়চোপড় আনি নাই।

পদ্মর মা বললেন, কাপড়ের ব্যবস্থা হবে।

ড্রাইভার ইসমাইলকে পাঠিয়ে নতুন লুঙ্গিপাঞ্জাবি কিনে আনানো হলো। ছগীর মিয়া-আয়োজন করে কলপাড়ে গোসল করতে বসেছে। তার মাথায় সাবান ঘসে দিচ্ছে পদ্ম। পদ্মর পাশেই তার মা বসা। ছগীর নিশ্চয়ই মজার কোনো কথা বলছে। মা-মেয়ে হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। পদ্ম ছগীর মিস্ত্রিকে ডাকছে 'দুষ্ট বাবা'। যতবারই পদ্ম 'দুষ্ট বাবা' ডাকছে, ততবারই ছগীর বিকট ভেংচি দিচ্ছে। ঘনিষ্ঠ পারিবারিক চিত্র।

বাবা এই দৃশ্য দেখে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, দাড়িওয়ালা ওই লোক কে?

তার নাম ছগীর। সে মোটর মেকানিক। তোমার গাড়ি ঠিক করে এনেছে। পদ্মর মায়ের চেনা লোক।

বিল কত করেছে?

কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না বলে মনে হচ্ছে। এখানে গোসল করছে কেন?

গোসল করে খাওয়াদাওয়া করে গেস্টরুমে ঘুমাবে। আমার ধারণা, পদ্মর মা নতুন গেস্টরুম এই লোকের জন্যে নিয়েছে। এতে তোমার যে সুবিধা হবে, তা হলো গাড়ি নষ্ট হলে চিন্তা করতে হবে না। গাড়ি সরাইয়ের মিস্ত্রি ঘরেই আছে।'

বাবা বললেন, তুমি এই ধরনের কথাবার্তা তোমার ভাইয়ের কাছে শিখেছ। নিজের মতো হও, অন্যের ছায়া হবার কিছু নাই।

আমি বিনীত গলায় বললাম, বাবা, এখন তাহলে যাই? একটা জরুরি কাজ করছি।

কী জরুরি কাজ করছ?

মিস্ত্রি ছগীরের গোসল দেখছি।

বাবার হতাশ চোখের সামনে থেকে বের হয়ে এলাম।

মিস্ত্রি ছগীর খাওয়াদাওয়া শেষ করে মাতাকন্যাকে নিয়ে বের হলো। গাড়ি টেস্টিং- হবে। ঘণ্টা দুই তারা গাড়ি নিয়ে ঘুরবে। নিউমার্কেটে নাকি কিছু কেনাকাটাও আছে। মা-মেয়ে দুজনই আনন্দে কলকল করছে। গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে পদ্ম এবং তার মা রিকশা করে ফিরে এল। গাড়ি আবার বসে গেছে। ছগীর গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে গেছে। আমি ভাইয়ার ঘরে শুয়ে আছি। আমার বুকের ওপর ভাইয়ার একটা বই। এসিমভের লেখা The Winds of Change. বইটা ভাইয়ার মতো উল্টো করে ধরেছি। পড়তে গিয়ে মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে—

‘Sraet otni tsrub dna deddon ehs.’

অনেকক্ষণ এই বাক্যটার দিকে তাকিয়ে দুটি শব্দের খোঁজ পেলাম। dna মানে and এবং ehs-এর মানে she.

বই উল্টা করে ধরে রেখেছেন কেন?

আমি বই নামিয়ে তাকালাম, পদ্ম ঘরে ঢুকেছে। তার হাতে চায়ের কাপ। সে কাপে চুমুক দিচ্ছে। পদ্ম বলল, চা খাবেন?

আমি বললাম, খেতে পারি।

পদ্ম চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, তিনটা চুমুক দিতে পারেন। এর বেশি না।

আমি উঠে বসতে বসতে বললাম, তোমার চুমুক দেওয়া চা আমি খাব কেন?

পদ্ম চেয়ারে বসতে বসতে বলল, খেতে না চাইলে নাই। চা-টা ভালো হয়েছে। এক চামচ খেয়ে দেখতে পারেন।

না।

পদ্ম বলল, ধমক দিয়ে 'না' বলার দরকার ছিল না। মিষ্টি করে বললেও হতো। যা-ই হোক, আমি কি কিছুক্ষণ গল্প করতে পারি?

হ্যাঁ, পারো।

হঠাৎ আপনার সঙ্গে গল্প করতে চাচ্ছি কেন, জানেন?

না।

পদ্ম হাসতে হাসতে বলল, আমিও জানি না।

আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। মেয়েটাকে আজ অন্য দিনের চেয়ে সুন্দর লাগছে। সাজগোজ কি করেছে? চোখে মনে হয় কাজল দিয়েছে। মেয়েরা সামান্য সেজেও অসামান্য হতে পারে।

পদ্ম বলল, আমি আপনাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব। উত্তর দিতে পারবেন?

আমি বললাম, ধাঁধা খেলার মধ্যে আমি নাই।

উত্তর দিতে পারলে পুরস্কার আছে।

কী পুরস্কার?

পদ্ম চাপা হাসি হেসে বলল, টাকা-পয়সা লাগে এমন কোনো পুরস্কার না। এ ছাড়া আমার কাছে যা চাইবেন তা-ই। ভয়ংকর খারাপ কিছুও চাইতে পারেন। ধাঁধাটা হচ্ছে, এমন একটা পাখির নাম বলুন যে পাখি মানুষের কথা বুঝতে পারে এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

পারলাম না।

ইশ! আপনার কপালে পুরস্কার নেই। পাখির নাম হচ্ছে ব্যাঙামা বাঙামি। রূপকথার বইতে পড়েন নাই?

আমি ছাড়াও নিশ্চয়ই অনেককে এই ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছ। কেউ কি পেরেছে?

একজন পেরেছিল।

সে কি পুরস্কার পেয়েছে?

সেটা আপনাকে বলব না।

পদ্ম চায়ের কাপ নিয়ে বের হয়ে গেল। আমি বই উল্টো করে ধরে আবার পড়ার চেষ্টা করছি। এর নাম সাধনা। সাফল্য না আসা পর্যন্ত সাধনা চালিয়ে যেতে হবে–

'em dlot ton dah uoy.'

এই তো, এখন পারছি, em হলো me, dlot হলো told.

ভাইজান, চা নেন।

রহিমার মা চা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, চা তো চাইনি, রহিমার মা।

পদ্ম আপা বলেছে, আপনি চা চাইছেন।

আমি উঠে বসে চায়ের কাপ হাতে নিলাম। রহিমার মা ক্লান্ত গলায় বলল, বড় ভাইজানের কোনো খবর জানেন?

আমি বললাম, না।

রহিমার মা বলল, ওনার তো মোবাইলও নাই যে একটা মোবাইল করব। মনটা এমন অস্থির হয়েছে, ওনাকে নিয়া একটা বাজে খোয়াব দেখেছি। কী দেখছি শুনবেন?

বলো, শুনি।

স্বপ্নে দেখলাম, উনি শাদি করেছেন।

এটা খারাপ স্বপ্ন হবে কেন? এটা তো ভালো স্বপ্ন।

খারাপটা এখনো বলি নাই। বললে বুঝবেন কত খারাপ! স্বপ্নে দেখলাম, শাদির কারণে দুনিয়ার মেহমান আসছে। কইন্যা যেখানে সাজাইতাছে, সেইখানে সুন্দর সুন্দর মেয়েছেলে। শইল ভর্তি গয়না, চকমকা শাড়ি। আমিও তাহার সাথে আছি, আমোদ-ফুর্তি করতাছি। আমার একটাই ঘটনা, শইল্যে কাপড় নাই। কাপড় দূরের কথা, একটা সুতাও নাই। কেমন লইজ্যার কথা চিন্তা করেন। এখন আমি কী করি, বলেন, ভাইজান?

আমি ভাইয়ার মতো হাই তুলতে তুলতে বললাম, তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। নেংটো হয়ে ঘর থেকে বের হবে না।

এটা কেমন কথা বললেন! নেংটা হয়ে ঘর থেকে কী জন্যে বের হব? আইজ পর্যন্ত শুনছেন নেংটা হইয়া কেউ ঘর থাইকা বাইর হইছে?

শুনেছি। জৈন ধর্মের সাধুরা বাড়িতে সব কাপড় খুলে রেখে বের হন। পাগলরাও তা-ই করে।

আপনার কি মনে হয়, আমি পাগল হয়ে গেছি?

এখনো হও নাই, তবে হবে।

রহিমার মা হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে, পাগল হওয়ার আশঙ্কা সে নিজেও বিশ্বাস করছে।

বড় ধরনের ক্রাইসিসের মুখোমুখি হলে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। সমুদ্রপারের জেলে-স্ত্রীরা প্রতিরাতেই স্বপ্ন দেখে, সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে তাদের স্বামীরা মারা গেছে।

আমাদের পরিবারের প্রধান, বাবা, ভয়ংকর ক্রাইসিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কী দুঃস্বপ্ন দেখছেন তা জানা যাচ্ছে না। বাবার ক্রাইসিসগুলো কী দেখা যাক–

১. দ্বিতীয় গেস্টরুম দখল হয়ে গেছে। পদ্মর মা সুচ হয়ে ঢুকে এখন ফাল হয়ে আছেন। কিছুদিনের মধ্যে ট্রাক্টর হবেন, এমন নমুনা দেখা দিয়েছে।

২. বাড়িতে দুটি দল তৈরি হয়েছে। বাবার দল অর্থাৎ সরকারি দল। পদ্মর মার দল অর্থাৎ বিরোধী দল। বিরোধী দল দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করছে। ড্রাইভার ইসমাইল সরকারি দল ত্যাগ করে বিরোধী দলে যোগ দিয়েছে। এখন সে দুই বেলাই পদ্মর মায়ের রান্না খাচ্ছে। তাঁর বাজার করে দিচ্ছে।

৩. মায়ের পা জোড়া লাগছে না। সারা রাত তিনি ব্যথায় চিৎকার করেন। বাবা ঘুমাতে পারেন না। ভোরবেলায় পায়ের ব্যথা খানিকটা কমে, তখন মা ঘুমাতে যান।

৪. যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত খড়ম পায়ের যে ভূত গেস্টরুমে থাকত, সে ঘরছাড়া হয়ে বাবার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। নানা ধরনের ভৌতিক কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে। বাবা তার আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছেন। বাবার পরিচিত এক পীরসাহবে তাবিজ দিয়েছেন। পঞ্চধাতুর তাবিজ। বাবা ডান হাতে বেঁধে রেখেছেন। তাবিজে লাভ হচ্ছে না, বৃদ্ধ ভূত যন্ত্রণা করেই যাচ্ছে। ভূতের যন্ত্রণার

নমুনা: মায়ের পায়ে ব্যথার কারণে বাবা অঘুম রাত কাটাচ্ছেন। হঠাৎ একটু চোখ ধরে এল, ঘুম এসে যাচ্ছে ভাব কিংবা ঘুম এসে গেছে, তখনই বাবার কানের কাছে বিকট ভৌতিক কাশি। বাবা ধড়ফড় করে জেগে উঠে দেখেন, কোথাও কেউ নেই। এই ঘটনা একবার ঘটেছে তা না, প্রতি রাতেই কয়েকবার করে ঘটছে। একদিন ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, জুতাজোড়া সামনে নিয়ে বসেছেন। বাঁ পায়ের জুতা পরেছেন [তিনি লেফট হ্যান্ডার, তাঁর সবকিছু বাঁ দিয়ে শুরু হয়], ডান পায়েরটা পরতে যাবেন, তাকিয়ে দেখেন জুতা নেই। সেই জুতা পাওয়া গেল বাথরুমের কমোডে। নোংরা পানিতে মাখামাখি। বৃদ্ধ ভূতের কাণ্ড, বলাই বাহুল্য।

ভাইয়া বাসায় থাকলে এই ঘটনার লৌকিক ব্যাখ্যা দাঁড়া করিয়ে ফেলত। ভাইয়া বলত, নানান ঝামেলায় বাবা আছেন ঘোরের মধ্যে। তিনি নিজেই নিজের জুতা কমোডে ফেলে এসেছেন। আর কানের কাছে কাশির ব্যাখ্যা হলো, বাবা নিজের কাশি শুনে জেগে উঠেছেন। তার ক্রনিক খুকখুক কাশি। ঘুমের মধ্যে এই খুকখুক কাশিই প্রবল শোনাচ্ছে বলে তিনি ধড়মড় করে জেগে উঠছেন।

বাবার ছোটখাটো ঝামেলার কথা এতক্ষণ বলা হলো। এখন বলা হবে প্রধান ঝামেলা। তিনি উকিলের নোটিশ পেয়েছেন। নোটিশে লেখা, 'সালমা বেগমের জমির ওপর অবৈধভাবে ঘরবাড়ি তুলে আপনি বাস করছেন। নোটিশ পাওয়ামাত্র আপনি সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। অন্যথায় আমরা আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব।'

নোটিশ পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে বাবার বয়স পাঁচ বছর বেড়ে গেল। তিনি বেতের ইজিচেয়ারে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুয়ে রইলেন। সন্ধ্যায় ড্রাইভার ইসমাইলের মাগরেবের আজান শুনে তিনি চেয়ার থেকে উঠলেন। অজু করে নামাজ পড়তে গেলেন। বাবাকে আমি এই প্রথম নামাজ পড়তে দেখলাম।

নোটিশের বিষয় আমি জানলাম রাত আটটায়। বাবা নিজেই নোটিশ হাতে আমার ঘরে ঢুকলেন। আমাকে বললেন, এখন আমাদের করণীয় কী? আমি এক্সট্রিম কিছু করার চিন্তা করছি। কাঁটা তুলতে হয় কাঁটা দিয়ে।

আমি বললাম, তুমি কী করতে চাচ্ছ? খুনখারাবি?

বাবা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, খুনখারাবির লাইনে চিন্তা করলে ব্যাঙা ভাইকে খবর দিতে হবে। উনি নিমেষে কার্য সমাধা করবেন, কেউ কিছুই জানবে না।

ব্যাঙা ভাইটা কে?

ভাইয়ার অতি পরিচিত একজন। ভাইয়াকে সে ওস্তাদ ডাকে।

এ রকম একটা ক্যারেক্টারের সঙ্গে তোমার ভাইয়ার পরিচয় কীভাবে হলো?

তা জানি না, তবে পরিচয় থাকায় আমাদের কত সুবিধা হয়েছে এটা দেখো। তোমাকে নিজের হাতে খুন করতে হচ্ছে না।

বাবা বললেন, Don't talk nonsense. তুমি এই নোটিশ নিয়ে মহিলার কাছে যাও। এ রকম একটা নোটিশ পাঠানোর অর্থ কী জেনে আসো।

আমি বললাম, আমি যাব না, বাবা। আমি গেলে ওই মহিলা আমার গায়ে এসিডের বোতল ছুড়ে মারবে। তুমি যাও, তুমি মুরব্বি মানুষ। তোমার গায়ে এসিড হয়তো মারবে না।

বাবা বেশ কিছু সময় অপলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নোটিশ হাতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

রাত এগারোটা বাজার কিছু আগে বাবার ঘরে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে দেখি বাবার সামনে পদ্মর মা বসে আছেন। বাবার হাতে উকিলের নোটিশ। আমি বাবার পাশের মোড়ায় বসলাম। বাবা অসহায়ের মতো কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমাকে দেখে খুব ভরসা পেয়েছেন, এ রকম মনে হলো না।

পদ্মর মা বললেন, ভাই, কী বলবেন বলুন। পদ্মর জ্বর এসেছে। তার গা স্পঞ্জ করতে হবে।

বাবা কয়েকবার গলা খাকারি দিলেন। তাতেও গলা তেমন পরিষ্কার হলো না। তিনি ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, আজ একটা উকিল নোটিশ পেয়েছি। আমাকে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।

পদ্মর মা বললেন, আপনার হাতে তো সময় আছে। ত্রিশ দিনের সময়। এখনই ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে তা তো না। জিনিসপত্র যদি নিয়ে যেতে চান, আমি নিষেধ করব না।

ভাবি, এই সব আপনি কী বলছেন?

পদ্মর মা খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, আপনাকে বিকল্প একটা প্রস্তাব দেই। প্রতি মাসে

কুড়ি হাজার টাকা করে আমাকে বাড়িভাড়া দিবেন।

আমি নিজের বাড়িতে থেকে আপনাকে বাড়ি ভাড়া দিব?

এটা আপনার নিজের বাড়ি না। আপনি আমার জমির ওপর অবৈধভাবে বাড়ি তুলেছেন। আমার কাছে কাগজপত্র আছে। আমার যা বলার আমি বলেছি। আপনার যদি তার পরেও কিছু বলার থাকে, কোর্টে বলবেন।

পদ্মর মা উঠে চলে গেলেন। হতভম্ব বাবার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, বাবা, তোমার জন্যে একটা গুড নিউজ আছে।

বাবা চাপা গলায় বললেন, গুড নিউজটা কী?

তোমার গাড়ি মনে হয় আবার ঠিক হয়েছে। ছগীর মিস্ত্রি গাড়ি নিয়ে এসেছে। এক কাজ করো, মাকে নিয়ে গাড়িতে করে ঘুরে আসো। তোমার ভালো লাগবে।

বাবা মূর্তির মতো বসে রইলেন। কোনো জবাব দিলেন না। মায়ের পায়ের ব্যথা মনে হয় খুব বেড়েছে। তাঁর কাতরানি শোনা যাচ্ছে। পায়ের হাড় জোড়া না লাগলে এ রকম ব্যথা হয় তা জানতাম না। অন্য কোনো সমস্যা না তো?

বাবা ক্লান্ত গলায় বললেন, রহিমার মা বলছে ড্রাইভার ইসমাইলের সঙ্গে জিন থাকে, এই বিষয়ে কিছু শুনেছ?

শুনেছি। জিনের নাম মাহি, তার স্ত্রীর নাম হামাছা। জিনের বয়স তিন হাজার বছর। স্ত্রীর বয়স জানি না। কিছু কম নিশ্চয়ই হবে।

তোমার বিশ্বাস হয়?

না।

বাবা বললেন, শেক্সপিয়ার বলেছেন, 'There are many things in heaven and earth.'

আমি বললাম, শেক্সপিয়ারের ওপর কথা নাই। উনি যখন বলেছেন তখন বিশ্বাস হয়।

বাবা বললেন, জিনরা ভবিষ্যৎ বলতে পারে। জিনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জানতে পারলে হতো।

মাহি সাহেবকে জিজ্ঞেস করব?

বাবা চুপ করে রইলেন। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো ধরে। এই প্রথমজনকে দেখলাম জিন ধরতে চাইছেন।

রগট সন অনুযায়ী আজ ০৩.০১.০১। সময় রাত নয়টা। ভাইয়ার ঘরে জিন নামানো হচ্ছে। ড্রাইভার ইসমাইল জায়নামাজে বসা। বাবা আর আমি খাটে বসে আছি। আমাদের দুজনই অজু করে পবিত্র হয়েছি। আগরবাতি জ্বলছে। দরজা-জানালা বন্ধ। ঘর অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ইসমাইল একমনে সূরায়ে জিন আবৃত্তি করছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে সূরার শব্দ মিলে অতি রহস্যময় পরিবেশ।

ইসমাইল সূরা আবৃত্তি বন্ধ করে বলল, মাহি উপস্থিত হয়েছেন। কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইলে আদবের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে সালাম দিবেন।

বাবা ভয়ে ভয়ে বললেন, আসসালামু আলায়কুম।

গম্ভীর এবং খানিকটা বিকট গলায় কেউ একজন বলল, ওয়ালাইকুম সালাম।

এই গলা ইসমাইলের না। তার গলা মেয়েলি। সে কি গলা চেপে এমন শব্দ বের করছে? ভেন্ট্রিকুয়েলিজম?

বাবা বললেন, জনাব, আমার বড় ছেলে কোথায় বলতে পারবেন?

তার নাম কী?

ডাক নাম টগর।

ভালো নাম বলেন।

আবদুর রশীদ।

জিন বলল, সে জঙ্গলে আছে। তার শরীর ভালো না।

কী হয়েছে?

বুখার হয়েছে।

তার কি বাড়িতে ফেরার সম্ভাবনা আছে?

এক বৎসর পরে ফিরবে। অল্প সময়ের জন্য। এই বাড়িতে সে থাকবে না।

বাবা বললেন, আমার আর কোনো প্রশ্ন নাই। মনজু, তুই কিছু জানতে চাস?

আমি বললাম, জনাব, আপনার স্ত্রীর কথা শুনেছি। ছেলেমেয়ে কি আছে?

আমার সাত ছেলে। মেয়ে নাই।

আপনাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কি আছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুম-হাম শব্দ হলো। তার সঙ্গে খকখক কাশি। ইসমাইল বলল, ভাইজান, আপনার কথায় মাহি বিরক্ত হয়েছেন।

আমি বললাম, সরি।
আমি বললাম, একটা শেষ প্রশ্ন, আপনাদের অসুখবিসুখ আছে বুঝতে পারছি। আপনি-কাশছেন। পাতলা পায়খানা, যাকে ভদ্র ভাষায় বলা হয় ডায়েরিয়া, তা কি আপনাদের হয়?
মাহি আমার প্রশ্নে খুব মনে হয় রাগল। হুম-হাম শব্দ বৃদ্ধি পেল। আর তখনই বন্ধ দরজায় কেউ ধাক্কাতে লাগল। প্রবল ধাক্কা। দরজা খুলে দেখি ভাইয়া দাঁড়িয়ে।

ভাইয়া বলল, দরজা বন্ধ করে কী করছিস? ঘর অন্ধকার কেন?
আমি বললাম, জিন নামানো হচ্ছে।
ভাইয়া বলল, ভেরি গুড। জিন নেমেছে?
আমি বললাম, নেমেছে, মনে হয় চলেও গেছে। তুমি ফিরে এলে কেন?
ভাইয়া বলল, যেদিন ঘর ছেড়েছি, সেদিন অমাবস্যা ছিল না। তার আগের দিন ছিল। কাজেই চলে এসেছি। এবার পঞ্জিকা দেখে, আবহাওয়া অফিসে খোঁজ নিয়ে বের হব। আরে, তোর ঘরে বাবাও বসে আছে দেখি! বাবা কেমন আছ?

বাবা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। পুত্রের ফেরত চলে আসায় তিনি আনন্দিত না দুঃখিত বোঝা গেল না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই রহিমার মাকে পোলাও রাঁধতে বললেন। পোলাও ভাইয়ার অতি পছন্দের খাবার।

সালামত এসেছে। ভাইয়ার ঘরে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে। সালামতকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। চোখ টকটকে লাল। দুটা চোখেই ময়লা। চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। সালামতের মাথা কামানো। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি।
ভাইয়া বলল, আপনার ঘটনা কী? দশ দিন পরে আসবেন বলে গেলেন। এক মাস পার করে এসেছেন।
সালামত বলল, মরতে বসেছিলাম, ভাইসাহেব। প্রথমে হলো টাইফয়েড, তারপর জন্ডিস।

এখন চোখ-ওঠা রোগ হয়েছে। সানগ্লাস খরিদ করেছিলাম; সানগ্লাস পরলে চোখে দেখি না বলে রেখে দিয়েছি।

পদ্মকে নিতে এসেছেন?

জি।

আপনার চোখের দিকে তাকালে পদ্ম যাবে না। সানগ্লাস পরুন। পদ্মকে ডাকি।

সালামত সানগ্লাস পরে বাড়ি কাঁপিয়ে কাশতে লাগল। ভাইয়া বলল, যক্ষ্মাও বাঁধিয়েছেন নাকি?

সালামত বলল, জি না। বৃষ্টিতে ভিজে বুকে কফ জমেছে। পদ্মকে ডেকে দেন, ভাইসাহেব। অধিক কথা বলা মানে সময় নষ্ট।

পদ্ম যেতে রাজি না হলে কী করবেন?

জোর করে তুলে নিয়ে যাব। লোকজন সঙ্গে করে এনেছি। এরা গাড়িতে বসা। আজ উনিশ বিশ যা হবার হবে। তবে...

বিকট কাশি শুরু হয় সালামতের, বাকি কথা শোনা গেল না।

পদ্ম এসেছে। সে সালামতের দিকে তাকিয়ে বলল, নিতে এসেছ?

সালামত বলল, হুঁ।

ট্রাক নিয়ে এসেছ?

না। নোয়া মাইক্রোবাস নিয়ে আসছি।

আমরা যাব কই?

প্রথমে আমার নানার বাড়িতে যাব। সুসং দুর্গাপুর। আমার বিশ্রাম দরকার।

পদ্ম বলল, চলো, রওনা দেই। মা বাড়িতে নাই। চলে যাওয়ার এখনই সময়। মা থাকলে নানা ঝামেলা করবে। যেতে দেবে না।

সালামত বলল, ব্যাগ-সুটকেস নেবে না?

পদ্ম বলল, ব্যাগ-সুটকেট গোছাতে গেলে দেরি হবে। মা চলে আসবে। আমার আর যাওয়া হবে না। চলো, চলো।

আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম, পদ্ম সত্যি সত্যি মাইক্রোবাসে উঠে চলে গেল। মাইক্রোবাস ভর্তি সন্দেহজনক চেহারার লোকজন। একজন আমার পরিচিত। আগারগাঁও বস্তিতে তাকে দেখেছি। সেদিনও তার গায়ে নীল গেঞ্জি ছিল, আজও ক খ গ লেখা নীল গেঞ্জি। তার মনে হয় একটাই গেঞ্জি।

এমন এক ঘটনা ঘটেছে, ভাইয়া নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। সে তার বিশেষ ভঙ্গিতে শোয়া। চোখ বন্ধ। কোলের ওপর বই। আমি ঘরে ঢুকে বললাম, ভাইয়া, কাণ্ডটা দেখেছ?

ভাইয়া বলল, হুঁ। ইন্টারেস্টিং মেয়ে।

আমি বললাম, এক বস্ত্রে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

ভাইয়া বলল, ফিরে আসবে বলেই এক বস্ত্রে গেছে। পৃথিবীর কোনো মেয়েই এক কাপড়ে বাড়ি ছাড়ে না। সীতাকে যখন রাবণ হরণ করে, তখনো সীতার হাতে পানের বাটা ছিল।

ভাইয়া বুকের ওপর থেকে বই নিয়ে পাশ ফিরল, এর অর্থ এখন সে ঘুমাবে। ভাইয়ার হচ্ছে ইচ্ছাঘুম, সে যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতিতে মাথার নিচে হাত রেখে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

সালামত এসে ভাইয়ার ঘুম ভাঙাল। সালামত ভীষণ উত্তেজিত। তার সঙ্গে নীলগেঞ্জিও এসেছে। নীলগেঞ্জি চোখ-মুখ শক্ত করে রেখেছে।

ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, কী সমস্যা?

সালামত বলল, পদ্ম কোথায়?

ভাইয়া বলল, এই প্রশ্ন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব। আপনি তাকে নিয়ে গেছেন, এখন আপনি বলছেন পদ্ম কোথায়। কিছু কিছু জিনিস আমি অপছন্দ করি, তার মধ্যে একটা হলো টালটুবাজি। আপনি টালটুবাজি করছেন।

সালামত বলল, আমি কোনো টালটুবাজি করছি না। অস্থির হয়ে আপনার কাছে এসেছি। ঘটনা বললেই বুঝবেন। আমরা শ্যামলী পর্যন্ত গিয়েছি, তখন পদ্ম বলল, 'আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দাও, আমি একটা জিনিস কিনব।' আমি বললাম, 'কী জিনিস বলো, আমি নিয়ে আসি।' সে বলল, 'উহুঁ, আমি আনব।' গাড়ি থেকে নেমে একটা দোকানে ঢুকল, আর দেখা

নাই। পালায়ে গেছে।

ভাইয়া বলল, পালিয়ে গেছে, নাকি কোথাও বেচে দিয়েছেন?

এই সব কী বলেন? নিজের বউ বেচব কীভাবে?

পরের বউ বেচার চেয়ে নিজের বউ বেচা সহজ না? আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে পদ্মকে হাজির করবেন। চব্বিশ ঘণ্টা পর আমি ব্যবস্থা নিব।

নীলগেঞ্জি বলল, কী ব্যবস্থা নিবেন?

ভাইয়া নীলগেঞ্জির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নির্বিকার গলায় বলল, তোমাকে খাসি করে দেব।

কী বললেন?

কী বললাম একবার শুনেছ, তোমাকে খাসি করা হবে। অণ্ডকোষ থেকে বিচি ফেলে দেওয়া হবে। একজন পাস করা ডাক্তার এই কাজটা করবেন, কাজেই ভয়ের কিছু নেই। আগে এনেসথেসিয়া করা হবে বলে ব্যথাও পাবে না।

নীলগেঞ্জির শক্ত চোখমুখ হঠাৎ লুজ হয়ে গেল। থুতনি খানিকটা ঝুলে গেল।- সালামতের মুখ হয়ে গেল শক্ত। সালামত বিড়বিড় করে বলল, ভাইসাহেব, আমি আপনার সঙ্গে কোনো ঝামেলায় যাব না। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না।

ভাইয়া বলল, আপনার সঙ্গে আমি ঝামেলায় যাচ্ছি না। আমি শুধু এই নীলগেঞ্জিকে খাসি করব। এ শামসুর লোক। শামসু নতুন করে ঝামেলা শুরু করেছে। একে খাসি করে দিলে শামসুর খবর হবে। শামসুর খবর হওয়া দরকার। এক দিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি, এখন বিদায়। পদ্মর খোঁজে বের হয়ে যান। হাতে সময় বেশি নাই।

দুজন চলে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর পদ্ম বাড়িতে ফিরল। তার হাতে আটটা হাওয়াই মিঠাই। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। সে আমাকে বলল, হাওয়াই মিঠাই খাবেন?

আমি বললাম, না।

আপনার ভাই কি খাবে?

সেটা আমার ভাই জানে।

পদ্ম বলল, এই বাড়ির সবার জন্যে আমি একটা করে হাওয়াই মিঠাই কিনেছি। আপনি

খাবেন না, বাকি সবাই কিন্তু খাবে। আমি মিষ্টি করে যখন বলব, তখন কেউ 'না' করবে না।

ভালো কথা, সবাইকে হাওয়াই মিঠাই খাইয়ে বেড়াও।

প্লিজ, একটা নেন না। এমন করেন কেন?

আমি হাত বাড়িয়ে নিলাম। পদ্ম খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, দেখলেন, আপনি কিন্তু নিয়ে নিয়েছেন।

আমি বললাম, তুমি আগ্রহ করে স্বামীর সঙ্গে গেলে আবার চলে এলে, এর মানে কী?

পদ্ম বলল, ও আমার স্বামী আপনাকে কে বলল?

তুমিই বলেছ।

আপনাকে রাগানোর জন্যে বলেছি। আমার আশপাশে যারা থাকে, তাদের রাগিয়ে দিতে আমার ভালো লাগে।

সালামত যদি আবার তোমাকে নিতে আসে, তুমি কী করবে?

তার সঙ্গে আবার যাব।

পরেরবার সে তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে।

পদ্ম হাওয়াই মিঠাইয়ে কামড় দিতে দিতে বলল, তার উচিত আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া।

সালামত রাত দশটায় আবার এল। তার চিমশে যাওয়া চেহারা আরও চিমশেছে। আগে চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল, এখন নাক দিয়েও পড়ছে। সালামত ফ্যাসফেসে গলায় ভাইয়াকে বলল, জনাব, মাফ করে দেন। হানিফকে রিলিজ দিয়ে দেন।

ভাইয়া বলল, হানিফটা কে?

শামসুর নিজের লোক।

নীলগেঞ্জি?

জি, জনাব। তারে রিলিজ দিয়ে দিলে শামসু ভাই আপনার সঙ্গে আর ঝামেলায় যাবে না।

ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, ঝামেলায় কেন যাবে না? আমি তো ঝামেলা পছন্দ করি।

ভাইসাহেব, আমি আপনার পায়ে ধরি।

সালামত সত্যি সত্যি ভাইয়ার পা ধরতে এগিয়ে এল। ভাইয়া বলল, আপনার হাত ময়লা-জীবাণুতে ভর্তি। এই হাতে পায়ে ধরবেন না। আগে সাবান দিয়ে ভালোমতো হাত ধুয়ে আসুন। বিজ্ঞাপনে দেখেছি, লাইফবয় সাবান জীবাণু ধ্বংস করে। পদ্ম ঘরে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন লাইফবয় সাবান আছে কি না। না থাকলে ড্রাইভার ইসমাইলকে বলুন, বাজার থেকে কিনে এনে দেবে।

সালামত বলল, আপনি একটা জিনিস বুঝেন, ভাইসাহেব। হানিফের কিছু হলে আপনি বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়বেন।

ভাইয়া হাসি-হাসি মুখে বলল, পৃথিবী বিশৃঙ্খলা চায়। শুধু পৃথিবী না, ইউনিভার্স বিশৃঙ্খলা চায়। এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। সেকেন্ড ল অব থার্মডিনামিকস বলে এনট্রপি বাড়বে। ডেলটা এস সমান সমান কিউ বাই টি। কিছু বুঝেছেন?

সালামত বলল, একটা জিনিস বুঝেছি, শামসু ভাইয়ের সঙ্গে আপনি ডাইরেক্ট অ্যাকশনে যেতে চান। ওনাকে সেটাই বলব। ভাইসাহেব, গেলাম।

পদ্মর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

সালামত কোনো উত্তর না দিয়েই বের হয়ে গেল। আমি ভাইয়াকে বললাম, নীলগেঞ্জিকে সত্যি সত্যি খাসি করা হচ্ছে?

ভাইয়া বলল, জানি না। অপারেশন হয়ে গেলে রহিমার মায়ের মোবাইলে খবর দিতে বলেছি। এখনো কোনো খবর আসেনি।

আমি বললাম, তোমার ব্যাপারটা কী, আমাকে বুঝিয়ে বলো তো।

ভাইয়া বলল, রগট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমি জানি 'শৃঙ্খলা' একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। প্রকৃতি বিশৃঙ্খলা চায় বলেই বিশৃঙ্খলা একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা। কিছু বোঝা গেল?

না।

বিশৃঙ্খলা হলো এনট্রপির বৃদ্ধি। প্রকৃতি তা-ই চায়। এখন বুঝেছিস?

না।

ভাইয়া হয়তো আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করত, তার আগেই রহিমার মা ঢুকে বলল,

ভাইজান, টেলিফোনে বলছে অপারেশন সাকসেস হইছে।
ভাইয়া বলল, গুড। বিশৃঙ্খলা হচ্ছে, এনট্রপি বাড়ছে।
রহিমার মা বলল, খালুজান আপনাদের দুইজনরে ডাকে।
ভাইয়া বলল, আবার মিটিং?
রহিমার মা বলল, জানি না। খালুজান খুব অস্থির।

বাবাকে যথেষ্টই অস্থির দেখাচ্ছে। সালামতের মতোই অস্থির। অস্থিরতার কারণ, ডাক্তাররা বলছে মায়ের পেটে ক্যানসার।
ভাইয়া বলল, ডাক্তার কখন বলল?
রাত আটটার সময় রিপোর্ট আনতে গিয়েছিলাম, তখন বলল। তোমার মাকে এখনো কিছু বলিনি। বলব কি না বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় বলা উচিত। টগর, তুমি কী বলো?
ভাইয়া বলল, বলা উচিত।
তাহলে তুমি তোমার মাকে বুঝিয়ে বলো, যাতে ভয় না পায়। চিকিৎসার আমি ত্রুটি করব না। প্রয়োজনে ঘরবাড়ি, জমি-সব বেচে দিব।
ভাইয়া বলল, কীভাবে বেচবে? সব তো পদ্মর মার নামে। অবশ্যি নকল দলিল।
বাবা বললেন, এই ঝামেলা তুমি বাজিয়েছ, তুমি ঠিক করো। It is an order.
ভাইয়া বলল, একদিকে ঝামেলা ঠিক করলে অন্যদিকে ডাবল ঝামেলা দেখা যায়, কাজেই ঝামেলা ঠিক করা অনুচিত।
বাবা হতাশ গলায় বললেন, আমি তাহলে কী করব? তুমি কি জানো, পদ্মর মা আমাকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে?
জানি। ঝামেলা না বাড়িয়ে তোমার উচিত বাড়ি ছেড়ে দেওয়া।
আমি কোথায় থাকব?
পথেঘাটে থাকবে। ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে ইংরেজিতে ভিক্ষা করবে। রাতে ঘুমাবার জন্যে চলে যাবে কমলাপুর রেলস্টেশনে। ভবঘুরেদের জন্যে সেখানে ঘুমাবার ভালো ব্যবস্থা আছে।

বাবা তাকিয়ে আছেন। মায়ের ক্যানসারের খবরে তার মধ্যে যে প্রবল হতাশা তৈরি হয়েছিল, তা কেটে গেছে। এখন তিনি বিস্মিত।

বাবা চাপা গলায় বললেন, আমি ইংরেজিতে ভিক্ষা করব আর রাতে কমলাপুর রেলস্টেশনে ঘুমাব?

ভাইয়া বলল, তুমি একা মানুষ। যেকোনো জায়গায় ঘুমাতে পারো।

আমি একা?

মা তো ক্যানসারে মারাই যাচ্ছে। মায়ের মৃত্যুর পর তুমি একা হয়ে যাচ্ছ। আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে তোমার উচিত পদ্মর মায়ের কাছ থেকে গ্রেসপিরিয়ড নেওয়া। মায়ের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তুমি এ বাড়িতে থাকবে। মৃত্যুর পর কুলখানির দিন গৃহত্যাগ করবে।

তুমি এই ধরনের কথা বলতে পারছ? তোমার জন্মদাতা মা। মা নিয়ে বিকট কথা! আর আমি তোমার বাবা।

ভাইয়া হেসে ফেলল।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, তুমি হাসছ?

হাসি এলে কী করব, বলো। হাসি চেপে রাখব? তুমি বোধহয় জানো না, হাসি চেপে রাখতে প্রচণ্ড এক শারীরিক প্রেশার হয়। এই প্রেশারে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। থ্রম্বসিস হতে পারে।

ইউ গেট লস্ট।

ভাইয়া উঠে দাঁড়াল। আমি অবাক হয়ে দেখি, তার ঠোঁটের কোনায় এখনো হাসি লেগে আছে।

বাবাও অবাক হয়ে ভাইয়ার ঠোঁটের হাসি দেখছেন। বাবা বললেন, তোমার মাকে তুমি কিছু বলতে যাবে না। তুমি মস্তিষ্কবিকৃত একজন মানুষ। কী বলতে কী বলবে, তার নেই ঠিক।

মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারব?

বাবা জবাব দিলেন না। ভাইয়া রওনা হলেন মায়ের শোবার ঘরের দিকে। পেছনে পেছনে আমি।

ভাইয়া বলল,কেমন আছ,মা?

মা বলল,ভালো। আজ ব্যথা নাই।

ভাইয়া বলল,মা,তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি,ভেবেচিন্তে জবাব দিবে। বলো তো তোমার গায়ের রক্ত আছে,এমন কাউকে কি তুমি খুন করতে পারবে?

তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

আমার শরীরে রক্ত আছে এমন কাউকে আমি কীভাবে খুন করব?

ভাইয়া বলল, ঘরে ঢুকতেই দেখলাম তুমি একটা মশা মারলে। মশার গায়ে তোমার রক্ত।

মা হতাশ চোখে তাকাচ্ছেন। তাঁকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। ভাইয়ার ঠোঁটের কোনায় মিটিমিটি হাসি। মা জেনেছেন,তাঁর পাকস্থলীতে ক্যানসার। অল্পদিনের মধ্যেই মারা যাবেন। তিনি যে খুব চিন্তিত,এ রকম মনে হচ্ছে না। এত বড় অসুখ বাঁধানোয় নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন। অন্যদের সঙ্গে টেলিফোনের কথাবার্তায় সে রকমই মনে হয়। তাঁর টেলিফোনে কথাবার্তার নমুনা–

রুনি!আমার খবর শুনেছিস।কী আশ্চর্য!কেউ বলে নাই?

আমার ক্যানসার হয়েছে। চিকিৎসা চলছে। বাঁচব মনে হয় না। কথায় আছে না,ক্যানসার নো আনসার। ক্যানসারের কারণে বিদেশ যাচ্ছি। টগরের বাবা বলেছে,আমাকে ব্যাংককে নিয়ে যাবে। দুই ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে দলবেঁধে বেড়ালাম। সেখানে ‘পাতায়া’ বলে একটা জায়গা আছে, খুব সুন্দর।

এমন অনেক আত্মীয়স্বজন বাসায় আসছেন,যাঁদের আগে কখনো দেখা যায়নি। খালি হাতে কেউ আসছেন না।ডাব,পেঁপে,হরলিক্সের কৌটা জড়ো হচ্ছে।মা প্রতিটি আইটেমের হিসাব রাখছেন।উদাহরণ,‘মনজু!ডাব চারটা ছিল,আরেকটা গেল কই?’

মা আনন্দিত, তবে বাবা বিধ্বস্ত। বিদেশযাত্রার খরচ তুলতে পারছেন না। গাড়ি বিক্রি করতে চেয়েছিলেন, সেটা সম্ভব হলো না। দেখা গেল, গাড়ির কাগজপত্রও পদ্মর মায়ের নামে। বাবা অবাক হয়ে ভাইয়াকে বললেন, তুমি গাড়ির কাগজপত্রও ওই মহিলার নামে করিয়ে দিয়েছ?

ভাইয়া বলল,না। এটা উনি নিজে নিজেই করেছেন। বাড়ির নকল কাগজপত্র তৈরি করে পথ দেখিয়ে দিয়েছি,এতেই কাজ হয়েছে। উনি নিজেই এখন পথ বানিয়ে এগোচ্ছেন। মহীয়সী মহিলা!

কী মহিলা বললি?

মহীয়সী মহিলা। পলিটিকসে ভালো কেরিয়ার করতে পারবেন। প্রথমে মহিলা কমিশনার, তারপর পৌরসভার চেয়ারম্যান,সেখান থেকে এমপি। এমপি হওয়ামাত্র তোমার এই গাড়ি বাতিল। নতুন শুল্কমুক্ত গাড়ি।

বাবা বললেন,খামাখা কথা বলছ কেন? চুপ করো।

ভাইয়া চুপ করলেন। বাবা গেলেন পদ্মর মায়ের কাছে। তিনি আগে পদ্মর মাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাতেন। এখন ডাকলে আসেন না বলে নিজেই যান। তাদের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে খুক্ খুক্ করে কাশেন। দেখে মায়া লাগে।

বেশ অনেকবার কাশাকাশির পর পদ্মর মা বের হয়ে এলেন। বিরক্ত গলায় বললেন,কিছু বলবেন?

গাড়ির বিষয়ে একটা কথা ছিল।

কী কথা?

গাড়ির আপনি নতুন করে কাগজপত্র করিয়েছেন। এখন গাড়িও আপনার নামে।

পদ্মর মা বললেন, এটাই তো হবে। বাড়িভাড়া হিসেবে মাসে বিশ হাজার করে টাকা গাড়ির দামের সঙ্গে কাটা যাচ্ছে। মাসে বিশ হাজার টাকা দিতে বলেছিলাম। এক পয়সা কি দিয়েছেন?

নিজের বাড়িতে থাকব আবার বাড়িভাড়াও দেব!

পদ্মর মা বললেন, পুরোনো কথা তুলবেন না। পুরোনো কথা শোনার সময় আমার নাই।

বাবা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আমি কত বড় বিপদে আছি, আপনি তো জানেন।

পদ্মর মা বললেন, আপনি এখন বিপদে পড়েছেন। আমি পদ্মর বাবার মৃত্যুর পর থেকেই বিপদে আছি। আমাকে আপনি বিপদের কথা শোনাবেন না। মায়ের কাছে মাসির গল্প করবেন না।

বাবা বললেন, আপনার বিপদে আমি সাধ্যমতো সাহায্যের চেষ্টা করেছি। মাঝেমধ্যে টাকা-পয়সা পাঠিয়েছি। আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি।

পদ্মর মা বললেন, ভাইসাহেব, উল্টা কথা বলবেন না। আশ্রয় আপনি দেন নাই। আশ্রয় আমি আপনাদের দিয়েছি। আমার জমিতে তোলা বাড়িতে থাকতে দিয়েছি। আপনার সঙ্গে এই নিয়ে আর বাহাস করতে পারব না। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হয় জ্বর আসবে।
হতাশ বাবা ডিকশনারি হাতে কলতলায় বসে রইলেন।

আমাদের সবার তিন মাসের ভিসা হয়েছে। মা ক্যানসারের ব্যথা ভুলে আনন্দে ঝলমল করছেন। বাবাকে ডেকে বললেন, আমার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে। 'না' করতে পারবে না। ক্যানসার হয়েছে, মারা যাব–এটা তো জানোই, ধরে নাও একজন মৃত মানুষের কথা।
বাবা বললেন, বলো, কী কথা।
রাখবে তো?
রাখব।
মা বললেন, টগর-মনজু প্রথমবারের মতো বিদেশ যাচ্ছে। ওদের স্যুট কিনে দিতে হবে। ওরা স্যুট-টাই পরে যাবে। স্যুট-টাই, নতুন জুতা।

বাবা বললেন, এসব তুমি কী বলছ?
মা বললেন, তুমিও নতুন স্যুট কিনবে। লাল রঙের টাই।
মা কিশোরী মেয়েদের মতো আহ্লাদী হাসি হাসতে লাগলেন।
বাবা বললেন, তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না। মাত্র আশি হাজার টাকা জোগাড় হয়েছে। এই টাকায় যাওয়া-আসার টিকিট হবে, তোমার চিকিৎসা হবে না।

মা বললেন, আমার চিকিৎসার দরকার নাই। যাওয়া-আসা হলেই হবে। তবে তিনজনেরই নতুন স্যুট লাগবে।

গ্রামের বসতবাড়ি বিক্রি করার জন্যে বাবা চলে গেলেন। আমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন, আমি নানান অজুহাত দেখিয়ে কাট মারলাম। চাকরিতে জয়েন করব, শুরুতেই অ্যাবসেন্ট হওয়া যাবে না। কথাটা মিথ্যা নয়। সোমবার আমার জয়েন করার কথা। শকুনশুমারি সামনের মাসের এক তারিখ থেকে শুরু হবে।

বাবার বসতবাড়ির কথা এই ফাঁকে বলে নিই। বসতবাড়িটা বেশ সুন্দর। বেশির ভাগ দরজাজানালা ভেঙে পড়ে গেলেও দক্ষিণমুখী একতলা পাকা বাড়ি। বাড়ির পেছনে- পুকুর। পুকুরে বাঁধানো ঘাট আছে। ঘাট এখনো নষ্ট হয়নি। বর্ষায় পুকুর ভর্তি পদ্ম ফুল ফোটে। দুপুর বারোটায় সব ফুল একসঙ্গে বুজে যায়। অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। পুকুরের চারপাশে আম-কাঁঠালের বাগান ছিল, এখন হয়েছে আম-কাঁঠালের জঙ্গল। সুন্দর এই জায়গাটা অন্যের হাতে চলে যাবে, ভাবতে খারাপই লাগছে। উপায় কী?

বাবার অনুপস্থিতি আমাদের জীবনযাত্রায় তেমন প্রভাব ফেলল না। যখন ব্যথা থাকে না, তখন মা আগের মতোই ডিভিডি প্লেয়ারে হিন্দি ছবি দেখেন। পাড়ায় নতুন একটা ডিভিডির দোকান হয়েছে। নাম 'ডিভিডি হোম সার্ভিস'। এরা বাড়ি বাড়ি ডিভিডি সাপ্লাই করে এবং নিয়ে যায়। ভাড়া দৈনিক কুড়ি টাকা। মা তাদের সক্রিয় সদস্য।

ভাইয়া আগের মতোই শুয়ে শুয়ে বই পড়ে সময় কাটাচ্ছে। গৃহত্যাগের কথাবার্তা তার মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে না। মায়ের অসুখের কারণে গৃহত্যাগ সাময়িক স্থগিত কি না, তা-ও বুঝতে পারছি না। ভাইয়া দাড়ি-গোঁফ কামানো সাময়িক বন্ধ রেখেছে। এখন তার মুখ ভর্তি দাড়ি। তাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। চেহারায় ঋষি ভাব আসি আসি করছে।

বাবার গাড়িটা মনে হয় শেষটায় ঠিকঠাক হয়েছে। ড্রাইভার ইসমাইল রোজই গাড়ি নিয়ে বের হচ্ছে। পেছনের সিটে সেজেগুজে পদ্ম এবং তার মা বসে থাকেন। নিয়মিত গাড়িতে চলার কারণেই কি না কে জানে, ভদ্রমহিলার চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে। আগে তিনি ঠোঁটে লিপস্টিক দিতেন না; এখন দিচ্ছেন।

পদ্ম ভালো আছে। সুখে এবং আনন্দে আছে। সে নতুন একটা খেলা শিখেছে। খেলার নাম সুডুকু। জাপানি কী একটা অঙ্কের হিসাবের খেলা। সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল। আমার গবেট মাথায় বিষয়টা ঢোকেনি। পদ্ম হতাশ হয়ে বলেছে, আপনাকে দেখে যতটা বোকা মনে

হয়, আপনি তার চেয়েও বোকা।
আমার ভাইয়ার অবস্থা কী?
পদ্ম বলল, তাঁর চেহারায় গবেট ভাব আছে, তবে তিনি বুদ্ধিমান।
আমি বললাম, ভাইয়া বুদ্ধিমান কী করে বুঝলে? তার সঙ্গে তো তোমার কথা হয় না।
পদ্ম বলল, কে বোকা, কে বুদ্ধিমান তা জানার জন্যে কথা বলতে হয় না। চোখ দেখেই বোঝা যায়। আপনাদের এই বাড়িতে সবচেয়ে বোকা রহিমার মা। তার পরই আপনি।
বোকামির দিক থেকে ফার্স্ট হওয়া গেল না?
না।
পদ্ম সুডুকু খেলা বন্ধ করে বলল, আমি যদি আপনাকে একটি জটিল প্রশ্ন করি আপনি উল্টাপাল্টা জবাব দেবেন। রহিমার মা কিছুই বলতে পারবে না। কিন্তু আপনার ভাই চমৎকার জবাব দেবেন।
আমি বললাম, প্রশ্নটা কী?
পদ্ম বলল, ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যখন প্রেম হয়, সেই প্রেমটা আসলে কী?
আমি বললাম, প্রেম হচ্ছে দুজনে একসঙ্গে ফুসকা খাওয়া। রিকশায় করে বেড়ানো। রাত জেগে মোবাইলে কথা বলা।
পদ্ম বলল, আপনার কাছ থেকে এই উত্তরই আশা করছিলাম। রহিমার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, পিরিতিরে বলে প্রেম। ভালো কথা, রহিমার মা যে প্রেগন্যান্ট, এটা জানেন?
আমি চমকে উঠে বললাম, না তো!
সে আড়ালে-আবডালে বমি করে বেড়াচ্ছে।
বলো কী?
পদ্ম বলল, সন্তানের বাবা কে, আন্দাজ করতে পারছেন?
না।
আমি জানি।

জানলে বলো কে?

আমি বলব কেন! আপনি খুঁজে বের করুন।

পদ্ম সুডুকু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। বসে থাকব, না ভাইয়ার কাছে যাব? শকুন বিষয়ে কিছু তথ্য জানব। প্রথম দিনের চাকরিতে শকুন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে যদি উত্তর না দিতে পারি, তাহলে লজ্জার বিষয় হবে।

পদ্ম মনে হয় সুডুকু ঝামেলা শেষ করেছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললাম–'কাহারও হাসি ছুরির মতো কাটে, কাহারও হাসি অশ্রুজলের মতো।' পদ্মর হাসি ছুরির মতো কাটে।

পদ্ম বলল, প্রেম বিষয়ে আমার কাছ থেকে জানতে চান? আমার ব্যাখ্যা?

বলো।

পদ্ম গম্ভীর মুখে বলল, প্রেম হলো এক ধরনের আবেগ, যা লুকানো থাকে। প্রেমিককে দেখে প্রেমিকার সেই আবেগ লুকানো অবস্থা থেকে বের হয়ে আসে। তখন হার্টবিট বেড়ে যায়। ঘাম হয়। পানির পিপাসা হয়। একসঙ্গে প্রবল আনন্দ এবং প্রবল বেদনা হয়। আনন্দ– কারণ, প্রেমিক সামনে আছে। বেদনা– কারণ, কতক্ষণ সে থাকবে কে জানে!

আমি বললাম, বাহ! ভালো বলেছ।

পদ্ম হাই তুলতে তুলতে বলল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রেমের ডেফিনেশন দিলাম। আপনি আশপাশে থাকলে আমার মধ্যে এই ব্যাপারগুলো ঘটে।

আমি বললাম, ঠাট্টা করছ?

পদ্ম বলল, হ্যাঁ। ঠাট্টা যে বুঝতে পারছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ।

ভাইয়ার কাছ থেকে শকুন বিষয়ে যা জানলাম, তার সারসংক্ষেপ–

শকুন

পৃথিবীতে দুই ধরনের শকুন আছে। পুরোনো পৃথিবীর শকুন এবং নতুন পৃথিবীর শকুন।

পুরোনো পৃথিবীর শকুন পাওয়া যায় আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপে। পরিবারের নাম Accipitrydae। এই পরিবারে আছে ইগল, বাজপাখি।

নতুন পৃথিবীর শকুন থাকে আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে। এদের পরিবার পুরোনো পৃথিবীর পরিবারের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয়। এই পরিবারের নাম Cathartidae। এদের বকপাখি গোত্রের মনে করা হয়।

শকুনকে (পুরোনো পৃথিবীর শকুন) বলা হয় 'মেথর পাখি'। এরা গলিত শবদেহ (পশু, মানুষ) খেয়ে পরিষ্কার করে বলেই মেথর। এদের দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ; আকাশের অনেক ওপরে থেকেও গলিত শব দেখতে পায় এবং এর ঘ্রাণ পায়।

শকুন কখনো সুস্থ প্রাণীকে আক্রমণ করে না। তবে আহত প্রাণীকে করে।

পৃথিবীর দুটি অঞ্চলে কোনো ধরনের শকুন নেই। অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা।

শকুন গবেষণার হেড অফিস মিরপুরে। ছিমছাম তিনতলা বাড়ি। বাড়ির নাম 'পবন'। এক ও দোতলায় শকুন গবেষণাকেন্দ্র। তিন তলায় 'বনলতা সেন রিসার্চ সেন্টার'। এই রিসার্চ সেন্টারের কাজ হলো, জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনকে খুঁজে বের করা। তবে এটা কোনো এনজিও নয়। ব্যক্তি-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রিসার্চ সেন্টার। এর কর্মীরা বনলতা সেনের পরিচয় উদ্ধারে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আমি শকুন গবেষণাকেন্দ্রের ফিল্ড সুপারভাইজার আব্দুস সোবাহান মোল্লা সাহেবের সামনে বসে আছি। বিস্ময়কর ঘটনা হলো, ভদ্রলোকের চেহারায় শকুনভাব প্রবল। শকুনের মাথায় পালক থাকে না; এঁর মাথায় একটি চুলও নেই। শকুনের ঠোঁট লম্বা এবং নিচের দিকে বাঁকানো; মোল্লা সাহেবের নাক যথেষ্ট লম্বা এবং নিচের দিকে খানিকটা ঝুঁকে আছে। তাঁর চোখও শকুনের মতোই তীক্ষ্ণ।ভদ্রলোক আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, চাকরিতে জয়েন করতে এসেছেন?

আমি বললাম, জি।

মোটরসাইকেল নিয়ে এসেছেন?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, মোটরসাইকেল কেন নিয়ে আসব? তা ছাড়া মোটরসাইকেল

পাবই বা কোথায়?

মোল্লা সাহেব তাঁর তীক্ষ চোখ আরও তীক্ষ করে বললেন, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে লেখা আছে–ফিল্ডকর্মীরা নিজেদের মোটরসাইকেল নিয়ে আসবেন। মোটরসাইকেলে করে তাঁরা শকুন অনুসন্ধান করবেন।

আমি বললাম, স্যার, আমাদের এই এনজিওর কোনো শাখা কি অস্ট্রেলিয়ায় আছে?

মোল্লা সাহেব বললেন, আমাদের শাখা সারা পৃথিবীজুড়ে। অস্ট্রেলিয়ার খোঁজ কেন জানতে চাচ্ছেন?

আমি বিনয়ী গলায় বললাম, যদি সম্ভব হয়, আমাকে অস্ট্রেলিয়ায় ট্রান্সফার করে দিন। অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ড অফিসাররা ঘরে বসে কাজ করতে পারবেন। তাদের মোটরসাইকেলের প্রয়োজন পড়বে না। কারণ, অস্ট্রেলিয়ায় কোনো শকুন নেই।

মোল্লা সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, যদি মোটরসাইকেল জোগাড় করতে পারেন তাহলে আসবেন। এখন বিদায়। অকারণ কথা শোনার সময় আমার নেই।

আমি শকুন অফিস থেকে বের হয়ে তিন তলায় বনলতা সেন রিসার্চ সেন্টারে চলে গেলাম। এখানে যদি মোটরসাইকেল ছাড়া চাকরি পাওয়া যায়।

বনলতা সেন অফিসটা দর্শনীয়। হালকা নীল রঙের বড় একটা ঘর হিম করে রাখা হয়েছে। একপাশে শাড়ি পরা এবং খোঁপায় বেলি ফুলের মালা জড়ানো শ্যামলা এক (নীল রং) মেয়ে কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে। সব শ্যামলা মেয়ের চেহারায় দুঃখী দুঃখী ভাব থাকে। এই মেয়েটির চেহারায় দুঃখী ভাব প্রবল। তার চোখ বড় বড়। মনে হচ্ছে, কাঁদার জন্যে সে প্রস্তুত।

মেয়েটির ঠিক মাথার ওপর জীবনানন্দ দাশের ছবি। এর উল্টো দিকে বনলতা সেন কবিতাটি বাঁধানো।

আমি দুঃখী চেহারার মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটি বলল, 'এত দিন কোথায় ছিলেন?' বনলতা সেনের মতোই ভাষ্য। মনে হয়, তাকে এভাবেই অভ্যর্থনা করতে বলে দেওয়া হয়েছে।

আমি বললাম, আপনাদের রিসার্চ সেন্টার সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি। আপনাদের কাজ

কেমন এগোচ্ছে?

মেয়েটি বলল, খুবই ভালো। সবার ধারণা, বনলতা সেন থাকতেন রাজশাহীর নাটোরে। কথাটা ভুল। বরিশালের একটা গ্রামের নাম নাটোর। বীরভূমেও নাটোর আছে। বনলতা সেনের জন্যে এসব অঞ্চলেও আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি।

কী ধরনের অনুসন্ধান?

পুরোনো নথিপত্র ঘাঁটা হচ্ছে। বয়স্ক মানুষের ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। পত্রিকা দেখা হচ্ছে। আমরা আধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ ইন্টারনেটের সাহায্যও নিচ্ছি।

আমি বললাম, আপনাদের কি ফিল্ডওয়ার্কার লাগবে? অনুসন্ধানের কাজে আমার ব্যাপক অভিজ্ঞতা আছে। এ মুহূর্তে আমি শকুন অনুসন্ধানের কাজে আছি। তবে শকুনের চেয়ে বনলতা সেনের অনুসন্ধান আনন্দময় হওয়ার কথা।

মেয়েটি বলল, চা খাবেন?

আমি বললাম, অবশ্যই খাব। আপনার নামটা কি জানা যায়?

মেয়েটি বলল, আমার নাম বনলতা। এটা নকল নাম। আসল নাম শ্যামলী। আমার বস ‘বনলতা’ নাম দিয়েছেন। বসের ধারণা, আমার চেহারা বনলতা সেনের মতো।

উনি কি বনলতা সেনকে দেখেছেন?

না। ওনার কল্পনার বনলতা।

আপনার বস কি বিবাহিত?

বনলতা হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বলল, ওনার দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বস আমাকে খুব পছন্দ করেন। ওনাকে বললে আপনার চাকরি হয়ে যাবে। আপনি একটা বায়োডাটা দিয়ে যান।

বায়োডাটা তো সঙ্গে নিয়ে আসিনি।

আপনি মুখে মুখে বলুন, আমি কম্পিউটারে নিয়ে নিচ্ছি।

আমি বনলতার সঙ্গে চা খেলাম। দুপুরের লাঞ্চ করলাম। খুবই আশ্চর্যের কথা, বনলতা অফিসের গাড়িতে করে আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

কখনোই কোনো মেয়ে আমার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। বনলতা কেন আগ্রহ

দেখাচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না। আমার চেহারার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের চেহারায় কোনো মিল কি আছে? ভালো করে আয়না দেখতে হবে।

আমার ধারণা ছিল, 'টেলিগ্রাম' বিষয়টা মোবাইল ফোনের কারণে দেশ থেকে উঠে গেছে। এখন কেউ আর 'Mother serious come sharp' জাতীয় টেলিগ্রাম করে না। ট্রেনে চলার সময় রাস্তার পাশে টেলিগ্রাফের খুঁটিও দেখি না। সংগত কারণেই মনে হয়, লোকজন টেলিগ্রাফের খুঁটি বিক্রি করে কটকটি কিনে খেয়ে ফেলেছে।

আমার সব ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এক দুপুরবেলা বাবার কাছ থেকে টেলিগ্রাম চলে এল। টেলিগ্রামের ভাষা এমনিতেই সংক্ষিপ্ত থাকে, বাবারটা আরও সংক্ষিপ্ত। তিনি লিখেছেন, 'Sold.' বাড়ি বিক্রি হয়েছে বুঝতে পারছি। কত টাকায় বিক্রি হলো, কিছুই জানা গেল না। বাড়ি বিক্রি করে তিনি গ্রামে পড়ে আছেন কেন, তা-ও জানা যাচ্ছে না। আমাদের তিন মাসের ভিসা দেওয়া হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে এক মাস চলে গেছে।

বাসার পরিস্থিতি বর্ণনা করা যাক। মায়ের শরীর আরও খারাপ করেছে। তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার চোখ কপালে তুলে বলেছেন, এখনো দেশে পড়ে আছেন? ওনার না ব্যাংককে চিকিৎসা হওয়ার কথা?

আমি বললাম, আমাদের দুই ভাই ও বাবা–এই তিনজনের স্যুট বানানো হয়নি বলে যেতে পারছি না। বাবা ঢাকায় নেই, তাঁর মাপ নেওয়া যাচ্ছে না। এটাই সমস্যা। আর কোনো সমস্যা না। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে। বাবার পুরোনো এক স্যুট থেকে মাপ নেওয়া হয়েছে।

অনকোলজিস্ট হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাছি ঢুকে যাওয়ার মতো বড় হাঁ। যাঁরা ক্যানসার নামক রোগের চিকিৎসক, তাঁদের বলে অনকোলজিস্ট। এই তথ্য আগে জানা ছিল না। মায়ের ক্যানসার হওয়ায় নতুন একটা শব্দ জানা গেল। 'জ্ঞান' নানাভাবে আসে। জ্ঞানের প্রবাহ সত্যই বিচিত্র।

স্যুট যে বানাতে দেওয়া হয়েছে, এটা সত্যি। হালকা ঘিয়া রং। এর সঙ্গে মানানসই টাই কেনা হয়ে গেছে।

মা শরীর ভয়ংকর খারাপ নিয়েও স্যুটকেসে জিনিসপত্র ভরছেন। বিশাল আকৃতির এই স্যুটকেস মায়ের দূরসম্পর্কের এক বোনের কাছ থেকে ধার হিসেবে আনা হয়েছে। এই খালার নাম ঝুনু খালা। তাঁর কাছে নানান ধরনের স্যুটকেস, হ্যান্ডব্যাগ আছে। বিদেশযাত্রীদের তিনি আগ্রহ করে স্যুটকেস ধার দেন এবং একপর্যায়ে বলেন, খালি স্যুটকেস ফেরত দিয়ো না। খালি স্যুটকেস ফেরত দিলে অমঙ্গল হয়। স্যুটকেসে কয়েকটা কসমেটিকস ভরে দিয়ো। শুধু সাবান আনবে না। ঘরে একগাদা সাবান।

ঝুনু খালার স্যুটকেসে মা অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস ভরছেন। দুএকটার উদাহরণ দেওয়া যেতে - পারে–

১. সুপারি কাটার সরতা। মা পান খান না। সরতা কেন যাচ্ছে বুঝতে পারছি না।

২. একটা সাতকড়ার আচারের ফ্যামিলি সাইজ বোতল। আমাদের বাড়ি সিলেটে না বলে আমরা সাতকড়া খাই না। এই আচারটা কেন যাচ্ছে কে জানে!

৩. একটা ছোট আখরোট কাঠের বাক্স। বাক্সে তালাচাবির ব্যবস্থা আছে। এ ধরনের বাক্সে মেয়েরা প্রেমপত্র লুকিয়ে রাখে। মায়ের কাছে প্রেমপত্র থাকার কোনো কারণ নেই। বাবা-মা কখনো আলাদা-মায়ের বিয়ে প্রেমের বিয়ে না। বিয়ের পর বাবা থাকেননি যে চিঠিপত্র লেখার সুযোগ হবে। বাবা এই প্রথম মাকে ছেড়ে এক মাস হলো গ্রামের বাড়িতে পড়ে আছেন।

গত এক মাসে বাসার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ড্রাইভার ইসমাইল গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে। পদ্মর মা থানাপুলিশে ছোটাছুটি করছেন। তাতে লাভ কিছু হচ্ছে না। পদ্মর- মা চাইছেন ইসমাইলের ছবি দিয়ে পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন ছাপাতে। তাতে লেখা থাকবে ‘একে ধরিয়ে দিন’। ইসমাইলের ছবি পাওয়া যাচ্ছে না বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাচ্ছে না। ছবি নিয়ে এক কাণ্ড হলো। রহিমার মাকে জিজ্ঞেস করা হলো তার কাছে ইসমাইলের ছবি আছে কি না।

রহিমার মা কেঁদেকেটে অস্থির। সে বলল, আপনারা আমারে কী ভাবেন? হারামজাদা চোর আমার কে? সে আমার স্বামী নাকি? তার কাছে আমি হাঙ্গা বইছি? আমি কী জন্যে তার

ছবি ব্লাউজের নিচে লুকায়া ঘুরব?

পদ্মর মা বললেন, ব্লাউজের নিচে ছবি লুকিয়ে রাখবে, এমন কথা তো আমি বলিনি।

রহিমার মা বলল, আমি যে অপমান হইছি, তার জন্যে বিচার চাই। বিচার যদি না হয়, আমি গলায় ফাঁস দেব।

সামান্য কারণে তুমি গলায় ফাঁস দেবে?

আপনি যা বলছেন তা সামান্য না। গরিবের ইজ্জত নিয়া কথা তুলছেন।

পদ্মর মা তখন অ্যাটম বোমা ফাটালেন। কঠিন গলায় বললেন, তুমি যে পেটে বাচ্চা নিয়ে ঘুরঘুর করছো, এতে তোমার ইজ্জতের হানি হচ্ছে না? আমি নিশ্চিত, বাচ্চার বাবা ড্রাইভার ইসমাইল। আমি নিজে অনেক রাতে ইসমাইলের ঘর থেকে তোমাকে বের হতে দেখেছি।

রহিমার মা ছুটে গেল ভাইয়ার কাছে। তার বিচার চাই। এই মুহূর্তে বিচার না হলে সে গলায় ফাঁস নেবে। চিঠি লিখে যাবে, তার মৃত্যুর জন্য পদ্মর মা দায়ী।

ভাইয়া শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। বই থেকে চোখ না তুলে বলল, তুমি তো লিখতে পারো না। কাগজ-কলম নিয়ে আসো, আমি লিখে দিই। তুমি শুধু টিপসই দিয়ে দাও।

রহিমার মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, এই আপনার বিচার?

ভাইয়া বলল, হুঁ। তবে পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দিতে পারি।

কী পরামর্শ দেবেন?

ভাইয়া নির্বিকার গলায় বলল, তুমি ইসমাইল ড্রাইভারের কাছে চলে যাও। তাকে চেপে ধরে বিয়ের ব্যবস্থা করো। সন্তান বাপের পরিচয় জানবে না, এটা কেমন কথা!

দীর্ঘ সময় ঝিম ধরে থেকে রহিমার মা বলল, তারে আমি কই পামু?

ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, ঠিকানা জোগাড় করা আমার কাছে কোনো ব্যাপার না। তুমি চাও কি না বলো।

রহিমার মা বলল, তারে একবার খালি আমার কাছে আইন্যা দেন। দেহেন, স্যান্ডেল দিয়া পিটায়া তারে কী করি।

ভাইয়া বলল, এনে দিচ্ছি। কান্নাকাটি বন্ধ করো। গর্ভাবস্থায় মায়ের অতিরিক্ত কান্নাকাটি

সন্তানের ওপর প্রভাব ফেলে। সন্তানের হাঁপানি রোগ হয়।
রহিমার মা কান্না বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে গলা নিচু করে বলল, হারামজাদাটারে কয় দিনের মধ্যে আনবেন?
ভাইয়া উদাস গলায় বলল, দেখি!

তলজগতে (Under world) ভাইয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে আমি চমৎকৃত। ভাইয়ার অ্যান্টি-গ্রুপের প্রধান শামসু মারা গেছে। আমাদের বাসায় যে পত্রিকা আসে (দৈনিক সুপ্রভাত), তার প্রথম পাতায় ছবিসহ খবর ছাপা হয়েছে। খবরের শিরোনাম−সাপের হাতে সাপের মৃত্যু
দলীয় কোন্দলে শীর্ষ সন্ত্রাসী শামসু নিহত
ছবিতে বিকৃত চেহারার একজনকে ফুটপাতে চিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তার হাতে ছোট পানির বোতল। বোতলের মুখ খোলা হয়নি।
শামসুর মৃত্যুর পেছনে ভাইয়ার কলকাঠি আছে, তা বোঝা গেল ব্যাঙার আগমনে। সে এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে এসেছে। আগে মিষ্টি আনা হতো হাঁড়িতে। এখন মিষ্টি আসে সুদৃশ্য কাগজের বাক্সে। রঙিন ফিতা দিয়ে সেই বাক্সে ফুল তোলা থাকে।
ব্যাঙা মিষ্টির বাক্স খুলল। সবাইকে মিষ্টি দেওয়া হলো। সবাই খেল, শুধু ভাইয়া বলল, না। রগট ধর্মের নীতিমালায় কোনো ঘটনাতেই আনন্দ প্রকাশ করা যায় না।
ভাইয়া রগট ধর্মে নতুন ধারা যুক্ত করেছে। এই ধর্মের অনুসারীদের বছরে একবার প্রাণী হত্যা করতে হবে। এমন প্রাণী, যার মাংস কোনো কাজে আসবে না। যেমন−কুকুর, বিড়াল।
আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রাণীদের মধ্যে মানুষ পড়ে কি না। ভাইয়া বলল, হোয়াই নট? নিম্নশ্রেণীর প্রাণী, নিজেদের হত্যা করতে হবে; তবে মানুষ প্রাণী কেউ নিজে হত্যা করতে না পারলে অন্যকে দিয়ে করালেও চলবে।
তোমার ধর্মে তীর্থস্থান বলে কিছু আছে?
ভাইয়া বলল, অবশ্যই আছে। যেসব জায়গায় একসঙ্গে অনেক মানুষকে হত্যা করা

হয়েছে, সেসব জায়গাই রগট ধর্মের তীর্থস্থান।
আমি বললাম, পুণ্য অর্জনের জন্য ওই সব জায়গায় যেতে হবে?
ভাইয়া বলল, রগট ধর্মে পুণ্য বলে কিছু নেই। সবই পাপ। পাপ বাড়ানোর জন্যে এসব জায়গায় রগট ধর্মের লোকজন যাবে, আনন্দ-উল্লাস করবে।

আমি বললাম, ভাইয়া, ঠিক করে বলো তো, তুমি কি অসুস্থ?

ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, অসুস্থতা রগট ধর্মের চাবিকাঠি।
শামসুর মৃত্যুর খবর ছাপা হওয়ার তিন দিনের মাথায় ড্রাইভার সালামত এসে উপস্থিত। ভয়ে-আতঙ্কে সে অস্থির। তাকে দেখাচ্ছে মৃত মানুষের মতো। সালামত বলল, ভাইজান! আমি আপনার পায়ে ধরতে আসছি।
ভাইয়া বলল, লাইফবয় সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসে পায়ে ধরো। নোংরা হাতে পায়ে ধরবে না। ভালো কথা, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি কথা বলবে? পদ্মকে ডেকে দেব?
সালামত কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এমন কথা মনেও স্থান দেবেন না। পদ্ম আমার কেউ না। আপনি অর্ডার দিলে আমি তারে মা ডাকব। এখন থেকে আমি আপনার হুকুমের চাকর।

পদ্ম আমার প্রতি অত্যন্ত নারাজ। তার নারাজির কারণ সম্ভবত বনলতা। এই মেয়েটি প্রায় রোজই আসছে। কেন, তা-ও স্পষ্ট নয়। আমাকে বলেছে, আমাদের বাড়ি তার অফিসে যাওয়ার পথে পড়ে এবং আমাদের বাসার চা অসাধারণ বলেই চা খাওয়ার জন্যে থামে।

পদ্ম আমাকে বলল, ওই নাকথ্যাবড়ি রোজ আসে কেন?
আমি বললাম, রোজ তো আসে না। মাঝেমধ্যে আসে।
কেন আসে?
আমার প্রেমে পড়েছে, এই জন্যে আসে।
পদ্ম বলল, আপনার প্রেমে পড়বে কেন? কী দেখে সে আপনার প্রেমে পড়বে? কী আছে আপনার?

আমার কিছুই নেই বলে সে আমার প্রেমে পড়েছে। আমার কিছু নেই বলে আমার প্রতি তার করুণা হয়েছে। করুণা থেকে প্রেম। এই প্রেমকে বলে ক-প্রেম। ঘৃণা থেকে প্রেম হয়, তাকে বলে ঘৃ-প্রেম। আমার প্রতি তোমার প্রেমের নাম ঘৃ-প্রেম।

আপনার প্রতি আমার প্রেম?

অবশ্যই। ঘৃ-প্রেম।

আপনার এই সব ফাজলামি আমি জন্মের মতো বন্ধ করতে পারি, এটা জানেন?

আগে জানতাম না, এখন জানলাম।
পদ্ম বলল, নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে আমি আপনার বিরুদ্ধে মামলা করব। আমি বলব, গভীর রাতে দরজা ভেঙে আপনি আমার ঘরে ঢুকেছেন। রেপ করতে চেয়েছিলেন। আমার চিৎকার-চেঁচামেচিতে পালিয়ে গেছেন।

সাক্ষী কোথায় পাবে?
আমার মা সাক্ষ্য দেবেন। আমি কী করব জানেন? নিজেই নিজের শরীরে আঁচড়েকামড়ে - দাগ করব। পুলিশকে বলব, এসব আপনি করেছেন।
পদ্ম ভয়ংকর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয়, এই কাজ সে সত্যি সত্যি করবে। অবশ্য না-ও করতে পারে। এক ডাক্তার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে। ছেলের নাম বদিউজ্জামান খান। ছেলে সুদর্শন। এমআরসিপি ডিগ্রি নিতে ইংল্যান্ড যাবে। যাওয়ার আগে বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবে। পদ্মকে তার খুবই পছন্দ হয়েছে। বনলতা যেমন ঘন ঘন এ বাড়িতে আসে, ডাক্তার বদিউজ্জামান খানও আসে।
বিয়ে মোটামুটি ফাইনাল হওয়ার পর ধর্ষণজাতীয় মামলা-মোকদ্দমা হওয়ার কথা নয়। মেয়ে ধর্ষণ মামলা করছে শুনলেই পাত্রের পিছিয়ে যাওয়ার কথা।
গ্রামের বাড়ি থেকে সম্বোধনহীন একটি চিঠি এসেছে। এই চিঠি কার কাছে লেখা, বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয়, সবার কাছেই লেখা। চিঠির সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে জামালও এসে উপস্থিত। জামালের কথা মনে আছে তো? ওই যে বাবার মানিব্যাগ ও মোবাইল ফোন নিয়ে

পালিয়ে গেল।
জামাল খালি হাতে আসেনি। এক আঁটি সজনে এবং জাটকার চেয়ে এক সাইজ বড় ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছে। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সে উঠান ঝাঁট দিতে শুরু করেছে। তাকে আমরা কেউ কিছুই বললাম না। শুধু রহিমার মা বলল, পুলা, তোর সাহস দেইখা ‘চমৎকার’ হইছি।
জামাল রহিমার মায়ের কথা ভ্রুক্ষেপও করল না। উঠান ঝাঁট দিয়ে সে তেলের বাটি নিয়ে ভাইয়ার পা মালিশ করতে বসল।
বাবা তাঁর চিঠিতে লিখেছেন–
‘বিরাট ঝামেলায় আছি। বাড়ি চার লাখ বিয়াল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। বায়নার পঞ্চাশ হাজার টাকা ছাড়া কোনো টাকা এখনো পাই নাই। যার কাছে বিক্রি করেছি সে আজ দিব, কাল দিব করছে। বড় ভুল যা করেছি তা হলো, বাড়ি বিক্রির দলিলে সই করে দিয়েছি। এখন কী করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।’

আওয়ামী লীগের নেতা ছানাউল্লাহ সাহেব, যাঁর নামে ছানাউল্লাহ সড়ক, দুবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন। দুবারই পদ্মর মায়ের সঙ্গে দরজা ভেজিয়ে বৈঠক করেছেন। ছানাউল্লাহ সাহেবের এক সঙ্গীকে গজফিতা নিয়ে বাড়ি মাপামাপিও করতে দেখা গেল।- ভাইয়াকে ঘটনা জানাতেই সে বলল, অতি চালাক মহিলা। সে এই বাড়ি বিক্রির তালে আছে। ঝামেলার বাড়ি তো, বিক্রি করে খালাস হয়ে যাবে। ঝামেলা অন্যের ঘাড়ে যাবে–‘যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাব জনিতা, কেনাপি ন প্রাজ্যতে’।
আমি বললাম, এর মানে কী?
ভাইয়া বলল, মানে বলতে পারব না। খুঁজে বের কর।

আমাদের পরিবারের অনেক নিরানন্দের মধ্যে একটি আনন্দের ব্যাপার হলো, আমি চাকরি পেয়েছি। বনলতা রিসার্চ সেন্টারে ফিল্ড ওয়ার্কারের চাকরি। মাসিক বেতন তিন হাজার টাকা। টিএ ডিএ আছে। দুই ঈদে বেতনের অর্ধেক বোনাস।

বনলতা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমার হাতে দিয়ে বলল, আপনাকে বলেছিলাম না, আমার বসকে বললেই আপনার চাকরি হয়ে যাবে?

বনলতা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছে। আমি বললাম, কাঁদছ কেন?

আপনার চাকরি হয়েছে, এই আনন্দে কাঁদছি।

আমি বললাম, চাকরি হওয়ার আনন্দে আমি কাঁদব। তুমি কেন কাঁদবে?

বনলতা আগে টিপটিপ করে কাঁদছিল, এই পর্যায়ে শাড়িতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠল।

উঠানে খাম্বা ধরে পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে। সে বনলতার দিকে তীক্ষ্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ড্রাইভার ইসমাইলের আজ বিয়ে। কনে রহিমার মা। চার লাখ টাকার কাবিন, অর্ধেক জেওর এবং শাড়িতে উসুল। বিয়ে পড়াচ্ছেন ব্যাঙা ভাইয়ের পরিচিত মাওলানা। বিয়ের খাবারের খরচ দিচ্ছে ব্যাঙা ভাই। হাজি নান্নামিয়া বাবুর্চি উঠানে ডেগ বসিয়ে রান্না চড়িয়েছে। আয়োজন ব্যাপক–

প্লেইন পোলাও

জালি কাবাব (সঙ্গে এক পিস পনির)

মুরগির রোস্ট (দেশি, ফার্মের না)

খাসির রেজালা

গরুর ভুনা

দই, মিষ্টি

কোক।

ব্যাঙা ভাই এত আয়োজন করেছে, কারণ এই উপলক্ষে দলের সবাই একত্র হবে। সবার একত্র হওয়ার জন্য উপলক্ষ লাগে। পদ্ম-উদ্ধার অভিযানে মাইক্রোবাসে আমার সহযাত্রীদের দেখতে পেলাম। ব্যাঙা ভাই আমাকে দরাজ গলায় বলল, ‘ভাইয়া! আপনার পরিচিত সবাইকে খবর দেন। ১০ জন ১২ জন কোনো বিষয় না। রাতে কাওয়ালির আয়োজন করেছি। বাচ্চু কাওয়াল আর তার দল। বিয়েশাদি গানবাজনা ছাড়া পানসে লাগে। বনলতা ছাড়া আমার পরিচিত কেউ নেই। তাকে খবর দিলাম। সে সেজেগুজে উপস্থিত হলো। নিজেই আগ্রহ করে কনে সাজানোর দায়িত্ব নিল।

অতি আনন্দঘন পরিবেশে শুধু বরকে বিমর্ষ ও আতঙ্কগ্রস্ত দেখাচ্ছে। পাগড়ি-শেরওয়ানি পরে সে চুপসে গেছে। তাকে দিনাজপুর থেকে ধরে আনা হয়েছে। ভাইয়ার কাছে সে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে গল্প (বিশ্বাসযোগ্য) ফেঁদেছিল। গল্পটা এ রকম–সে গাড়িতে তেল নেওয়ার জন্য পেট্রলপাম্পে গেছে। গাড়িতে তেল ভরা হচ্ছে, সে কাউন্টারে গেছে টাকা দিতে। টাকা দিয়ে গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখে পেছনের সিটে দুজন অপরিচিত লোক বসে আছে। একজনের হাতে পিস্তল। ঘাড়ে পিস্তল ঠেকিয়ে তারা ইসমাইলকে বগুড়ায় নিয়ে যায়। বগুড়ায় এই দুজনের সঙ্গে আরও তিনজন যুক্ত হয়। তারা গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে ডাকাতি করে। সেখান থেকে তারা তাকে নিয়ে যায় দিনাজপুরে।
গল্প শুনে ভাইয়া বলল, ডাকাতির ভাগ পাও নাই?
ইসমাইল বলল, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তারা করেছে, আর ক্যাশ দিয়েছে তিন হাজার ৭০০ টাকা।
ভাইয়া বলল, টাকাটা আছে?
ইসমাইল বলল, তিন হাজার আছে।
ভাইয়া বলল, তিন হাজার টাকায় তো বিয়ে হয় না। যা-ই হোক, কী আর করা! টাকাটা নিয়ে ব্যাঙার সঙ্গে যাও। তোমার স্ত্রীর জন্য বিয়ের শাড়ি কিনে নিয়ে আসো। আজ সন্ধ্যায় রহিমার মায়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে।
হতভম্ব ইসমাইল বলল, কাজের মেয়েকে আমি বিয়ে করব কেন?
ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, কেন বিয়ে করবে তার কারণ তুমি ভালোই জানো। খামাখা কথা বলে আমাকে বিরক্ত করবে না। আজ একটা আনন্দের দিন। বাড়িতে বিয়েশাদি। এই দিনে বিরক্ত হতে ইচ্ছা করে না।
ইসমাইল বিড়বিড় করে বলল, ভাইজান, আপনি যা বলবেন তা-ই হবে।
সন্ধ্যার পর থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করল। ব্যাঙা ভাই কানে কানে আমাকে অতিথিদের পরিচয় দিতে লাগল। নকশাদার পাঞ্জাবি পরা সুন্দরমতো চেহারা যারে দেখতেছেন, তারে সবাই ডাকে প্রফেসর। ডেনজার আদমি। ভেরি ডেনজার।
আপনাদের দলের?

না, মালেক গ্রুপের। আমি সবাইরেই দাওয়াত দিয়েছি। বলা যায় না, মালেক ভাই আসতে পারেন।

আমি বললাম, পুলিশ এসে বাড়ি ঘেরাও করলে একসঙ্গে সবাইকে পেয়ে যাবে।

ব্যাঙা ভাই হাসতে হাসতে বলল, পুলিশের দুই কমিশনার দাওয়াতি মেহমান। ঘোগ থাকে বাঘের ঘরে। এই জন্য বলে 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'।

ভাইয়া! ওই দেখেন মালেকের বডিগার্ড। মনে হয় না ক্লাস নাইন টেনে পড়ে! বয়স অল্প হইলেও ধাইন্যা মরিচ। সে যখন আসছে, মালেক আসবে। বরিশাল গ্রুপও চলে আসবে, ইনশাল্লাহ।

বিয়েবাড়ির হইচই এবং ব্যস্ততার মধ্যে বাবা এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখাচ্ছে কালবৈশাখী ঝড়ে চুপসে যাওয়া কাকের মতো। তিনি উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হতাশ চোখে বিয়েবাড়ির আয়োজন দেখতে লাগলেন। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। বাবা বললেন, কী হচ্ছে?

আমি বললাম, বিয়ে হচ্ছে।

বাবা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ও আচ্ছা!

কার বিয়ে হচ্ছে, কী সমাচার, কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না, যেন অনেক দিন পর বাড়িতে ফিরে বিয়েবাড়ির হইচই দেখবেন এটাই স্বাভাবিক।

আমি বললাম, তোমার কি শরীর খারাপ?

বাবা ক্ষীণ গলায় বললেন, শরীর ঠিক আছে। তবে বিরাট ঝামেলায় আছি।

বাড়ি বিক্রির বাকি টাকাটা পাও নাই?

পেয়েছি। পুরোটাই পেয়েছি।

তাহলে আর ঝামেলা কী?

টাকাটা চুরি হয়ে গেছে। চুরি না, ডাকাতি। গতকাল সন্ধ্যার সময় পুরো টাকাটা পেয়েছি। রাত নয়টায় ট্রেনে উঠব। সব গোছগাছ করছি এমন সময় তিনজন লোক ঢুকল। একজনের হাতে ছুরি। গরু কোরবানি দেয় যে, এমন ছুরি। দুজন আমাকে জাপ্টে ধরে মেঝেতে শুইয়ে ফেলল। ছুরি হাতের লোক বলল, যা আছে দে। না দিলে জবাই করে

ফেলব।

আমি বললাম, তুমি গরম পানি দিয়ে গোসল দাও। জামাল এসেছে, সে তোমার গায়ে সাবান ডলে দেবে। জামাল ফিরে এসেছে। ওই দেখো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাবা জামালের দিকে তাকাতেই জামাল এগিয়ে এল, লজ্জিত গলায় বলল, আব্বা, ভালো আছেন?

বাবা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। তবে তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি জামালকে ঠিক চিনতে পারছেন না। আমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, টাকা চুরির বিষয়ে তোরা তোর মাকে কিছু বলিস না। মনে কষ্ট পাবে। এই অবস্থায় মনে কষ্ট পাওয়া ঠিক না। এতে রোগের প্রকোপ বাড়ে।

বাবার সঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎকার অংশটি চমৎকার। বাবা মায়ের ঘরে ঢুকে বিছানার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে বাবাকে বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে কদমবুসি করলেন। বাবা বললেন, শরীরের অবস্থা কেমন?

মা বললেন, অনেক ভালো। ব্যথা দিনে দুইবারের বেশি ওঠে না। ব্যথাও আগের চেয়ে কম।

বাবা বললেন, Good.

মা বললেন, মনজু তোমার পুরোনো স্যুটের মাপে স্যুট বানাতে দিয়েছে। কোমরের ঘের এক গিরা বেশি দিয়েছে। তুমি একটু মোটা হয়েছ তো, এই জন্য। দোকানে গিয়ে ট্রায়াল দিয়ে এসো তো।

বাবা বললেন, আচ্ছা।

মা বললেন, তোমার স্যুটকেস আমি গুছিয়ে রেখেছি। টুথপেস্ট, ব্রাশ, শেভিং রেজার−সব ভরেছি। একটা জায়নামাজও নিয়েছি। হঠাৎ হঠাৎ তুমি নামাজ পড়ো তো, এই জন্য।

বাবা বললেন, ঠিক আছে।

বাড়িতে এত খাবারদাবার! বাবা কিছুই খেলেন না। পিরিচে করে সামান্য দই নিয়ে দুই চামচ মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। পায়ের কাছে বসে জামাল তাঁর পা টিপতে লাগল। বাবা ক্লান্ত গলায় বললেন, লেখাপড়া শিখতে হবে, বুঝলি। লেখাপড়া না শিখলে অন্যের পা টিপে জীবন পার করতে হবে। লেখাপড়া শিখবি না?

জামাল বলল, হুঁ, শিখুম।

বাবা বললেন, আধুনিক এক ইংরেজ কবির নাম সিলভিয়া প্লাথ।

জামাল বলল, জি, আব্বা।

বাবা বললেন, ছাত্রদের ক্লাসে একদিন তাঁর কবিতা পড়ে শোনালাম। কেউ অর্থ বুঝল না। লেখাপড়া না থাকলে যা হয়।

জামাল বলল, ঠিকই বলেছেন, আব্বা।

বাবা জ্বরের ঘোরে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন–

If I have killed one man, I have killed two

The vampire who said he was you

And drank my blood for a year...

সিলভিয়া প্লাথের এই দীর্ঘ কবিতা আমার ও ভাইয়ার মুখস্থ। বাবা মুখস্থ করিয়েছেন। বাবার কাছে কবিতা মুখস্থের পরীক্ষা দিতে গিয়ে ভাইয়া পুরো কবিতা উল্টো করে বলল; যেমন–‘Two killed have I, man one killed have I if ’.

বাবা হতাশ গলায় বললেন, তোকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে পাবনার পাগলাগারদে রেখে আসা উচিত। দেরি করা ঠিক না।

নিমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই চলে গেছে। ড্রাইভার ইসমাইল বউ নিয়ে গেছে নাখালপাড়া। সেখানে ইসমাইলের চাচার বাসায় বাসর হবে। বিয়ে উপলক্ষে প্রচুর গিফট উঠেছে। এর মধ্যে মালেক গ্রুপের প্রধান মালেক ভাই দিয়েছেন দুই ভরি ওজনের সোনার হার। যাঁর নাম প্রফেসর, তিনি দিয়েছেন দামি একটা মোবাইল ফোন। বরিশাল গ্রুপ দিয়েছে ১৪ ইঞ্চি কালার টিভি। পদ্মর মা দিয়েছেন একটা জায়নামাজ এবং কোরআন শরিফ। বনলতা দিয়েছে আকাশি রঙের দামি একটা জামদানি শাড়ি।

আমি ভাইয়াকে বললাম, সবাই কিছু না কিছু গিফট দিয়েছে, তুমি তো কিছুই দিলে না! তুমি হলে বিয়ের আসরের তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

ভাইয়া বলল, আমি কোনো উপহার দিইনি তোকে কে বলল? সবার আড়ালে গোপনে তাকে চমৎকার উপহার দিয়েছি।

কী উপহার?

তার পাছায় কষে একটা লাথি দিয়েছি, সে হুমড়ি খেয়ে দেয়ালে পড়েছে।

ভাইয়া হো হো করে হাসছে। আমি হাসতে গিয়ে হাসলাম না। অবাক হয়ে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাকে কী সুন্দরই না লাগছে!

কলপাড় থেকেও হাসির শব্দ আসছে। পদ্ম ও বনলতা হাসছে। রাত বেশি হয়েছে বলে বনলতা থেকে গেছে। আজ রাতে সে পদ্মর সঙ্গে ঘুমাবে। অল্প সময়েই দুজনের ভেতর ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে।

সারা দিন তীব্র গরম ছিল। আকাশ ভর্তি মেঘ, কিন্তু মেঘ বৃষ্টি হয়ে নিচে নামছিল না। মধ্যরাতে মেঘের মানভঞ্জন হলো। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। ভাইয়া বলল, বৃষ্টিতে ভিজবি নাকি?

আমি বললাম, তুমি বললে ভিজব। তোমার রগট ধর্ম কী বলে? বৃষ্টিতে ভেজা যায়?

ভাইয়া বলল, ভেজা যায় না। আনন্দ হয় এমন কিছুই রগট ধর্মের অনুসারীরা করতে পারবে না। কষ্ট হয় এমন কিছুই শুধু করা যাবে। কষ্ট পাওয়া যায় এমন ঘটনা শোনা যাবে।

আমি বললাম, কষ্ট পাওয়া যায় এমন দুটা খবর তোমাকে দিতে পারি। দেব?

ভাইয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। আমি বললাম, বাবার বসত বিক্রির সব টাকা ডাকাতে নিয়ে গেছে।

ভাইয়া বলল, ভালো করেছে।

আমি বললাম, এখন বাবার গায়ে আকাশ-পাতাল জ্বর। জামাল বাবার মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে।

ভাইয়া বলল, বাবা থাকুক বাবার মতো। আয়, আমরা বৃষ্টিতে ভিজি।

আমরা দুই ভাই কলপাড়ে বসে আছি। মাথার ওপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবহাওয়া পাল্টাচ্ছে। আজকাল দেখি বৃষ্টি মানেই ঝোড়ো বাতাস। উঠানে বাতাসের ঘূর্ণির মতো তৈরি হচ্ছে। ভাইয়া বলল, বাবা যে অতি শুদ্ধ একজন মানুষ, এটা তুই জানিস?

আমি বললাম, বাবা বোকা মানুষ এইটুকু জানি, শুদ্ধ মানুষ কি না জানি না। তবে মা অতি শুদ্ধ মহিলা।

ভাইয়া হাসতে হাসতে বলল, শুদ্ধ পিতা এবং শুদ্ধ মাতার সন্তান আমার মতো অশুদ্ধ হয় কী করে, তার কারণ জানিস?

আমি বললাম, না। তুমি জানো?

ভাইয়া বলল, জানি। কঠিন ধাঁধার উত্তর সব সময় খুব সহজ হয়। এই ধাঁধার উত্তরও খুব সহজ। চিন্তা করতে থাক। না পারলে আমি বলে দেব।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বনলতা আসছে। তার হাতে দুটো চায়ের কাপ। কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। বনলতা বলল, আপনাদের দুজনের জন্য চা নিয়ে এসেছি। আমি এক সিনেমায় দেখেছিলাম, নায়ক ঝুমবৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে কফি খাচ্ছে। আপনাদের বাড়িতে কফি নেই বলে চা এনেছি।

ভাইয়া বলল, থ্যাংক ইউ। তুমি কি আমাদের দুই ভাইয়ের মাঝখানে বসে বৃষ্টিতে ভিজতে চাও?

বনলতা বলল, না। আমার হাইফেন হতে ভালো লাগে না। আমি একা একা ভিজব। পদ্মকে নিয়ে ভিজতে চেয়েছিলাম। পদ্মর মা তাকে ভিজতে দিচ্ছে না।

ভাইয়া বলল, তোমাকে প্রায়ই এ বাড়িতে দেখি। এর কারণ কী?

বনলতা জবাব দিল না।